12



কার্ল মার্কস

মুরারি ঘোষ

কার্ল মার্কস

লেখক সমবায়ের অন্যান্য বই

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥ বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ॥ মুঘল ভারতের সংগীতচিন্তা

ক্ষিতিমোহন সেন ॥ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

শ্রীবিষ্ণু দে ॥ রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা

শ্রীসুকুমার বসু ॥ হিমালয়

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ॥ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব

শ্রীগোপাল হালদার ॥ ভারতের ভাষা

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ দান্তে আলিগিএরি

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার ॥ রবীন্দ্র-মানস

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ॥ হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান

কার্ল মার্কস

মুরারি ঘোষ

লেখক সমবায় সমিতি

কলিকাতা ২৬

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৭৮
এপ্রিল ১৯৭১

প্রকাশক
শ্রীজ্যোৎস্না সিংহ রায়
লেখক সমবায় সমিতি লিমিটেড
৭৩-বি শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে রোড
কলিকাতা ২৬

পরিবেশক
দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি । মনীষা । বাক্-সাহিত্য
ইণ্ডিয়ানা । সুবর্ণরেখা

মুদ্রক
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

মূল্য ৭·০০

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিষয়সূচী

জন্ম ও শিক্ষা

কার্ল মার্কস যখন জন্মগ্রহণ করেন পিতা হার্শেল লেভি (Herschel Levi) ছিলেন ধর্মে ইহুদী। কার্লের ছ' বছর বয়সে হার্শেল লেভি সপরিবারে স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিলেন। ইহুদী সমাজে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাই লেভিকে ধর্মত্যাগে প্ররোচিত করেছিল। এমনকি তিনি হার্শেল লেভি নামটিও পরিবর্তন করে নিজের নতুন নামকরণ করলেন—হাইনরিখ মার্কস। 'মার্কস লেভি' ছিল তাঁর পিতার নাম। পিতা ইহুদীশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। পিতার নামের প্রথমাংশটি হার্শেল নিজের নতুন নামকরণে পদবী হিসেবে জুড়ে নিলেন।

কার্ল মার্কসের পিতাই কেবল ব্যতিক্রম নন। নানা সামাজিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে খৃষ্টীয় সমাজের আশ্রয় নেওয়া সে যুগে ইহুদীদের মুক্তির উপায় বলে স্বীকৃত ছিল। এমনকি যে ইহুদী কবি হাইনে একদা এই ধর্ম পরিবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, তাঁকেও শেষ পর্যন্ত সামাজিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে খৃষ্ট ধর্মের পক্ষপুটে আসতে হয়। হাইনে ধর্মান্তরিত হন হাইনরিখের পরের বছরই।

ইহুদী ধর্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করে জার্মান জাতীয়তাবাদ মনে প্রাণে গ্রহণ করার সুযোগ নিয়ে হাইনরিখ মার্কস নিজের পারিবারিক জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা করলেন তার সম্পূর্ণ ফলভোগ করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্ল মার্কস। পুরো নাম—কার্ল হাইনরিখ মার্কস।

কার্ল জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে। রাইন উপত্যকায় মোসেল নদের দক্ষিণ তীরে প্রাসিয়ার প্রাচীন শহর 'ট্রিয়ের' (Trier) কার্ল মার্কসের জন্মভূমি। মার্কসের মায়ের নাম হেনরিয়েটা। হাইনরিখ ও হেনরিয়েটার আটটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকেন চারজন। কার্ল মার্কস ও তাঁর তিন বোন—সোফি, এমিলি ও লুইসি। সকলের মধ্যে সোফিই হলেন জ্যেষ্ঠ।

বাইরের জগৎ সম্পর্কে মার্কসের যখন সবে জ্ঞান হতে শুরু হয়,—সেই ছ' বছর বয়সে কিছুটা সংস্কারমুক্ত জগতের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার যে আশ্চর্য যোগাযোগ মার্কসের জীবনে ঘটে তার পরিণতি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এর চূড়ান্ত পরিণতির ইতিহাসই আমরা আজ জানতে বসেছি। হাইনরিখ মনে প্রাণে মানবিকতাবাদী ও সংস্কারমুক্ত পুরুষ। পুত্রকে মানুষ করে তোলার সচেতন চেষ্টা হাইনরিখের ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল দূরদৃষ্টিও। কেননা পুত্রের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসিক প্রবণতার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে আশঙ্কিত হয়ে পড়তেন তিনি। মুক্ত আলো-বাতাসের সংসর্গ শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্তানকে কোন্ পরিণতির পথে নিয়ে যাবে এই চিন্তাও ছিল। চিন্তা কখনো কখনো দুশ্চিন্তার রূপ নিত।

হাইনরিখ কুসংস্কার ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলেন এমন এক জায়গায় যেখানে জীবন সংস্কারমুক্ত হয়েও নির্বিঘ্ন ও নিয়মতান্ত্রিক—বিশৃঙ্খল নয়। কিন্তু পুত্রের প্রবণতা পালিয়ে আসা নয়—গোঁড়ামির মূলে আঘাত করা, কুসংস্কার উচ্ছেদ করা। মার্কসের মনের এই কঠিন রূপ কী কারণে জানা নেই তাঁর বালক বয়স থেকেই গড়ে ওঠে। পিতা হাইনরিখের চোখ তা এড়ায়নি। পুত্রের এই দিক্‌টা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করতেন। অথচ পুত্রের সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ মনটাকেও তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন।

পুত্রের দিকে যাঁর এতটা নজর তাঁর রকম থেকে স্বভাবতই ধরা যায় কী চোখে তিনি নিজের সন্তানকে দেখতেন এবং কী গভীর ভালবাসায় তাঁকে বেঁধে রেখেছিলেন মনে মনে। পিতার এই স্নেহপ্রবণতা কিশোর মার্কসের অজানা ছিল না। পুত্রের কুড়ি বছর বয়সে যখন হাইনরিখ দেহ রাখলেন, কঠিনহৃদয় মার্কসের মন থেকে পিতার অস্তিত্ব মুছে যায়নি। মার্কসের জীবনীকার বলেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পিতার সকরুণ স্মৃতি মার্কসের অশেষ সম্পদ্ ছিল।

ট্রিয়ের শহরে স্থানীয় হাইস্কুলে মার্কসের পড়াশুনো শুরু। মার্কসের স্কুল জীবনের খবর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। উল্লেখযোগ্য কিছু শোনা না গেলেও স্কুল জীবনে মার্কসের শ্রমশীলতার কথা শোনা যায়। বিশেষ করে প্রবন্ধ রচনায় কিশোর মার্কস পরিশ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতেন।

গণিতে ও ধর্মশাস্ত্রে আকর্ষণ ছিল এবং বাড়তি আকর্ষণ ছিল সাহিত্যে ও শিল্পে।

সাহিত্য ও শিল্পের প্রসঙ্গে মার্কসের জীবনে স্মরণীয় দুটি নাম—প্রথম জন পিতা হাইনরিখ মার্কস, দ্বিতীয় ব্যক্তি ট্রিয়ের শহরের বহুমান্য নাগরিক ফ্রাইহের লুডভিগ ফন ওয়েস্টফালেন। ওয়েস্টফালেন উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী। পিতৃবন্ধু। শিক্ষায় ও উদার মতামতে ওয়েস্টফালেন সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি যাঁরা উনিশ শতকের জার্মানীর সমস্ত প্রগতিমূলক আন্দোলনের নেতা। গ্যয়ঠে, শিলার ও হোল্ডারলিনের প্রত্যক্ষ প্রভাব যাঁদের জীবনে, স্বভাষায় বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমায় যাঁরা দান্তে, শেক্সপিয়ার, হোমার এবং গ্রীক নাট্যকারদের আত্মস্থ করেছেন এবং জার্মানীর রোমান্টিক আন্দোলনের যাঁরা জন্মদাতা। ওয়েস্টফালেনের আরো বাড়তি কৃতিত্বও ছিল—য়ুরোপের সাতটি ভাষায় ছিল তাঁর সত্যকারের দখল। হোমার ছিল কণ্ঠস্থ গ্রীক ভাষায়—শেক্সপিয়ার ইংরেজী ভাষায় ও জার্মান ভাষায়।

এমনিতেই ওয়েস্টফালেন যথেষ্ট আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। মানসিক ঔদার্যে সামান্যতম ঘাটতিও ছিল না। বন্ধু হাইনরিখ মার্কসের কিশোর পুত্রকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি কখনো। অবশ্য কিশোর মার্কসের পরিশীলিত মন, জ্ঞানস্পৃহা ওয়েস্টফালেনকে মুগ্ধ করে থাকবে। পুত্রপ্রতিম সঙ্গীকে ওয়েস্টফালেন প্রায় প্রতিদিন ভ্রমণে সঙ্গ দিতেন, বিশ্বসাহিত্যের গল্প শোনাতেন, ইসকাইলাস, শেক্সপিয়ার, সারভান্টিস থেকে অংশবিশেষ আবৃত্তি করে শোনাতেন। স্কুল জীবনের শেষ ক'বছর এই অতি মূল্যবান্ ও মনোরম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মার্কস নিজের রুচি ও মানসিক ঔৎকর্ষ গঠন করে নিতে পেরেছিলেন। এই ঘনিষ্ঠতা মার্কসের জীবনে চিরকালীন সম্পদ্ হয়ে দাঁড়ায়। শিল্প সাহিত্যের মানবিক মূল্যবোধের প্রথম পাঠ ওয়েস্টফালেনের কাছেই নেওয়া। পরবর্তী জীবনে মার্কসের মুখ থেকে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণের বর্ণাঢ্য কাহিনী অনেকেই শুনেছেন।

মার্কসের ডক্টরেট থিসিস্ ওয়েস্টফালেনকে উৎসর্গ করা।

শুধু এখানেই শেষ নয়—পিতৃপ্রতিম ওয়েস্টফালেনের অনুপম সুন্দরী দুহিতা জেনী ওয়েস্টফালেনের হৃদয়মন মার্কসের কাছেই সমর্পিত ছিল।

মার্কসের স্কুল জীবন শেষ হল সতেরো বছর বয়সে। মার্কস বন বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভর্তি হলেন। স্কুলের শেষ দু' এক বছর মার্কস তাঁর শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা, অনুবাদে কৃতিত্বের স্বাক্ষর এবং ভাষা ও ভাবের দুরূহতা যেখানে অনেকের ধ্রুব সাহিত্য পাঠে ব্যাঘাত ঘটায়, সে সব জায়গায় কিশোর মার্কসের অনায়াস গতিবিধি শিক্ষকদের কাছে বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু ট্রিয়ের জিমনাসিয়ামের পাঠ শেষ করে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের প্রথম বছর কিছুমাত্র উৎসাহজনক ছিল না। প্রায় নিষ্ফলা বছর। এই বছরটাই সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে হাইনরিখ ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

মার্কসের বয়স এখন আঠারো। এই সময়কার ঘটনাগুলো বিচার করলে মার্কসের মানসিক পরিস্থিতির একটা হদিস মিলবে। একটা অস্থির চিত্ত ও সাময়িক দোদুল্যমান মনের অধিকারী মার্কসের সামনে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ আর চিরকালীন রহস্যময় প্রেমের অনিশ্চিত হাতছানির প্রতিক্রিয়া দেখি। আঠারো বছরের যুবক মার্কস—সেই আঠারো বছর বয়সের দুঃসহ জ্বালা বহন করা সুকঠিন হয়ে পড়েছিল বৈকি। বনে মার্কসের ছাত্রজীবন পিতার আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এখানে মার্কস বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি শ্লেগেলের কাছে হোমারের পাঠ নিয়েছেন, গ্রীক পুরাণ ও ল্যাটিন কবিতার আস্বাদ নিয়েছেন, জুরিসপ্রুডেন্স ও পোলিটিক্যাল ইকোনমি পড়েছেন—কিন্তু মানসিক স্থিরতা ছিল না।

পড়াশুনোর ব্যয়ের জন্যে পিতা যে অর্থ পাঠাতেন তা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে দেনায় দাঁড়াতো। পড়াশুনোয় যতটা মন তার চেয়ে বেশি মন গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাবেশে, সোসাইটিতে, নাচের আসরে। বন্ধুকৃত্যের উজানস্রোতে কিছুকাল মার্কস গা ভাসিয়ে দিলেন। এক ধরনের বহির্মুখিনতা সেই সময়ের অন্তর্মুখী মার্কসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এর সম্ভাব্য কারণ আলোচনা করার আগে এ সময়ের হাইনরিখ মার্কসের ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। কেননা ঘটনাস্রোতের ঠিক বিপরীত বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মার্কসের উপর পিতার প্রভাব কী ভাবে কাজ করেছিল পুত্রের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলোর প্রতিক্রিয়া থেকেই তা পাওয়া যাবে। মার্কসের দুর্বলতার সন্ধানটুকু পিতার অজানা ছিল না। একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন সদা আশঙ্কা ছিল, তেমনি পুত্রের অস্থিরতার বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ঘটনার

গতি ঘুরিয়ে দেবার মত ক্ষমতাও তাঁর ছিল। যুক্তিবাদী চিন্তার যে বীজ তিনি পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, তার সার্থকতা প্রমাণিত হল এক বছরের মধ্যে বন শহর ছেড়ে মার্কস যখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন তখন।

কিন্তু এই সাময়িক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু কী? নিঃসন্দেহে জেনী ফন ওয়েস্টফালেন। কিশোর বয়সের সখ্যতা ততদিনে আর একটু গভীরতায় গিয়ে পৌঁচেছে—প্রেমে যার পরিণতি। কিন্তু মার্কসের থেকে জেনী বছর চারেকের বড়—মার্কসের দিদি সোফিয়ার সখী। জেনীর বয়স বাইশ—মার্কসের আঠারো। জেনীর বাবা বিত্তশালী—মার্কস তুলনায় দরিদ্রসন্তান। জেনী ট্রিয়ের শহরের সেরা সুন্দরী—শুধু সেরা নয়—সবার সেরা। শহরের অনেক সুন্দরীর যেমন ঈর্ষার কারণ, তেমনি বহু ভাগ্যবান্ বিত্তশালী যুবকের দিনরাতের স্বপ্নের উপকরণও। জেনীর বাবার কাছে এমন অনেক প্রস্তাব ছিল যেখানে জেনীর ভবিষ্যৎ সুখ সম্পদ্ চিরজীবনের জন্যে বাঁধা থাকতে পারে। কিন্তু আঠারো বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া যুবকের কাছে উদ্ভিন্নযৌবনা বাইশ বছরের জেনীর ভবিষ্যৎ কী? যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বিদুষী জেনী ওয়েস্টফালেনের কাছে ভবিষ্যৎ চিন্তা ছেলেখেলার বিষয় ছিল না। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা এই অপরিণত প্রেমিকপ্রবরের মানসিক অস্থিরতা জেনীর যেমন চিন্তার কারণ ছিল, তেমনি এক কঠিন আদর্শবাদী পরিশীলিত মননশীলতার অধিকারী মার্কসকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেও মনে করা কঠিন ছিল। তবু ইহলৌকিক সুখের খোঁজে ব্যক্তি কার্ল মার্কসকে কোনো-দিনও পাওয়া যাবে না জেনীর তা অজানা ছিল না। মার্কসের ত নয়ই। নিজের মনকে মার্কস সেদিন থেকেই চিনতে শুরু করেছিলেন যেদিন থেকে জেনীর চিন্তা মার্কসকেও উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল। স্বভাবতই ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়—কিন্তু সে ভাবনা মার্কসকে জীবনসংগ্রামে অর্থোপায়ের সুগম পথের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। তবু জেনীকে ছাড়া মার্কসের ভবিষ্যৎ নেই—সে ভবিষ্যৎ যত দুরূহ আর বিপদসঙ্কুল হোক, কষ্টের হোক, মার্কস নিরুপায়।

পিতার কাছে মার্কস তাঁর মনকে খুলে ধরতে পেরেছিলেন। হাইনরিখ মার্কসের চোখ তখন কপালে ওঠার কথা। স্বপ্নেরও অগোচর এই প্রস্তাব।

বনের পাঠ শেষ করার কয়েক মাস আগে মার্কস ট্রিয়ের শহরে এসেছিলেন। সেই অস্থিরচিত্ত উদ্‌ভ্রান্তমনা যুবক। জেনীর সম্মতি আদায় করে মার্কস আবার ফিরে গিয়েছিলেন বনে। পিতাকে না জানিয়ে উপায় ছিল না, কেবল জানতেন না ব্যারণ ওয়েস্টফালেন—ওয়েস্টফালেনকে জানাবার সাহস কারুরই ছিল না।

হাইনরিখ মার্কস ভেবেই পান না ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ভবিষ্যতের কোন্ অতল গহ্বরে এর পরিণতি। মার্কসের সঙ্গে জেনীও ডুববে। কিন্তু মার্কস তাঁর একমাত্র সন্তান—বয়সের তুলনায় কার্লের পরিণত বুদ্ধি ও ততোধিক বিচক্ষণতার উপর হাইনরিখের আস্থা ছিল। ছিল বলেই পিতৃ-হৃদয়ের আশঙ্কা চিঠি মারফৎ তুলে ধরতেন প্রবাসী পুত্রের কাছে। সেই আশঙ্কার মধ্যে যেমন ভয়ার্ত পিতৃমনের ছবি থাকতো, থাকতো পুত্রের পরিণত মনের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য আবেদনও।

হাইনরিখ যতটা বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের কথা ভেবে রেখেছিলেন—তার চেয়েও বেশী জটিল ও কষ্টকর দুঃখের মধ্য দিয়ে মার্কসকে জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে। কিন্তু ধনীকন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা জেনী ওয়েস্টফালেনের স্বজীবনের প্রতি এতটুকুও মোহ লক্ষ্য করা যায় নি। বাইশ বছর বয়সেই জেনী যখন সম্মতি দিয়েছিলেন তখন থেকেই হয়তো আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতের কোন্ যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে পুড়ে জীবন কাটাতে হবে। যে প্রস্তুতি মনে মনে ছিল বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ বিস্ময়করভাবে সার্থক হয়েছে। হাইনরিখের আশঙ্কা কিছুটা হয়তো সত্য, কিন্তু মার্কসের জীবন, জেনীর জীবন দুঃখের অতলান্তে নিশ্চিহ্ন হয়নি। জেনী চিরদিনই মার্কসের প্রেরণাদাত্রী, করুণময়ী—উজাড় করা প্রেমের অশেষ উৎস।

বনে পড়াশুনো ভাল হল না। হাইনরিখ প্রস্তাব দিলেন বার্লিনে যাওয়ার। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে মার্কস প্রবেশিকা পরীক্ষা (Matriculation) পাশ করলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেটের তারিখ ১৮৩৬, ২২শে অক্টোবর।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তখন হেগেলের নামে গৌরবান্বিত। যদিও পাঁচ বছর আগে হেগেল দেহ রেখেছেন কিন্তু তাঁর সৌরভ জার্মানীর দশ দিক্ ভরে রেখেছে। জার্মান ছাত্রদের পরমতীর্থ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন

জার্মানীর সেরা পণ্ডিতেরাও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। হেগেলের পদতলে বসে যাঁরা শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—লুডভিগ ফয়েরবাখ, ডেভিড স্ট্রউস, ব্রুনো বাউয়ের। বাউয়ের আবার হেগেলের সহকর্মীরূপে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন।

হাইনরিখের ইচ্ছে মার্কস আইনশাস্ত্রে পারঙ্গম হন। কিন্তু মার্কসের মনের ইচ্ছে তা না হলেও পিতাকে খুশী করাই কাম্য। হেগেলের প্রভাবান্বিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মার্কসের মত ছাত্রের আইনশাস্ত্র পাঠ অসংগত মনে হওয়াই স্বাভাবিক—কিন্তু আইন তখন জার্মানীর ছাত্রদের কাছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার রাস্তা খুলে দিয়েছে। সরকারী কাজে কর্মে আইনজ্ঞ ছাত্রদের বড় চাকরি বাঁধা থাকতো। হাইনরিখ নিজেই ছিলেন আইনজ্ঞ আর আইনের সোজা সড়কে যখন জীবন আরো মসৃণ হবার প্রতিশ্রুতি পায়—হাইনরিখ স্বভাবতই উজ্জলতর ভবিষ্যতের আশায় সন্তানকে সেই পথেই দেখতে চেয়েছিলেন।

মার্কস আইন পাঠে মন দিলেন কিন্তু মন পড়ে রইলো দর্শনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পাঠ্যবস্তুতে। বার্লিনে মার্কসের শিক্ষাজীবন বনের থেকে এমন কিছু উজ্জলতর হোল না। যেটুকু না করলে নয়—না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকু পাওয়া যাবে না—মার্কসের আইন পাঠে মনোনিবেশ ততখানি ছিল। পুত্রের পাঠে মনোযোগ এবং পরীক্ষায় সাফল্য পিতা হাইনরিখের যতখানি কাম্য ছিল মার্কস তা পূর্ণ করতে পারছিলেন না।

মার্কসের এই অমনোযোগিতা কিসের? এখানেও সেই মনের দ্বন্দ্ব, মানসিক অস্বস্তি—বন থেকে যাকে সঙ্গী করে নিয়ে এসেছেন। ট্রিয়েরের প্রতিশ্রুতিও মানসিক দাহের প্রতিষেধক হয়নি। কেননা ট্রিয়ের থেকে বার্লিনে জেনীর একটাও চিঠি আসতো না। নির্বাক্ জেনীর প্রেম মার্কসকে যতখানি অস্বস্তির মধ্যে রেখেছিল ততখানি মুখর করেছিল চিঠির পাতায়, কালির আঁচড়ে। জেনীকে চিঠি লেখায় মার্কসের কসুর ছিল না, কিন্তু জেনী নির্বাক্, নিঃশব্দ।

এই যন্ত্রণার কাহিনী মার্কস কিন্তু পিতার কাছে খুলে লিখেছিলেন। প্রতিশ্রুতি পেয়েও আশঙ্কায় মার্কস দিশাহারা। কেননা অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতির মূল্য কতখানি তা কোনো দেশের কোনো প্রেমিকের কাছেই অজ্ঞাত নয়। জলের-আঁচড়েও প্রেমের প্রতিশ্রুতি লেখা হয়ে থাকে।

জেনীর দিক্ থেকেও একটা অস্বস্তির কারণ ছিল। তাঁর পিতামাতার অজ্ঞাতসারে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওঁদের বিনা অনুমতিতে ভবিষ্যৎ জীবনের শপথ কী করে রক্ষা হবে? মার্কসকে চিঠি না দিলেও জেনী ট্রিয়েরে মার্কসের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। সোফির সঙ্গে বন্ধুত্ব, এদিকে মার্কসের পিতাও স্নেহ করতেন যথেষ্ট। পিতার কাছ থেকে চিঠি মারফৎ এ খবরও মার্কস পেতেন। কিন্তু প্রেমের জটিল নিয়মে তাতে কোনো সান্ত্বনাই মেলে না।

কার্লের বিবেচনার উপর পিতার গভীর আস্থা। নইলে কোন্ পিতাই বা ছাত্রজীবনে পুত্রের প্রেমে সম্মতি দিতে পারে? যদি জীবনে প্রাথমিক অঙ্গীকার শূন্যগর্ভ হয়ে ওঠে তাহলে প্রেমের প্রতিশ্রুতি কোন্ স্বর্ণময় ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে আসবে? একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, আর একদিকে জেনী—কার্লের দ্বিধাবিভক্ত দুই পারের মনে হাইনরিখ সেতুবন্ধ রচনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান কার্লকে পিতা নানাভাবে উৎসাহ জোগাতেন।

পিতার আসল ভয় কিন্তু প্রেমিকপ্রবর কার্লকে নিয়ে নয়। পুত্রের এই সাময়িক অস্থিরতার চেয়ে হাইনরিখের চোখে যা বেশী ভয়ের কারণ মনে হয়েছিল তা কার্লের অপরিচিত আদর্শবাদ ও এক ধরনের ভাবালুতা। আদর্শবাদ ও ভাবালুতা যে কোনো ছাত্রের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য তীরবিদ্ধ করতে যথেষ্ট। নেহাৎ স্বপ্নের মধ্যে বিচরণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া কার্লের ইহজাগতিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিতে পারে এই আশঙ্কায় হাইনরিখের রাতের ঘুম প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক চিঠিতে হাইনরিখ বলেছেন: "My heart throbs when I think of you and your future. And yet at times I cannot rid myself of the painful feeling when like a flash of lightning the thought comes to me that the goodness of your heart may upset the firmness of your mind; whether amidst your dreams you have room for the earthly things, which are so necessary to a man with a good heart, if you are not ruled by a terrible demon who so often destroys men, no matter whether he is of heavenly or hellish nature."

মার্কসের কর্মমুখর দীর্ঘ সংঘাতময় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দু' এক বছর অনেক জীবনীকারের লেখনীতে অনুল্লেখ্য থেকে গেছে। তবু মার্কসের অনন্য-সাধারণ জীবনের এই সাময়িক ক্ষণটুকুর মূল্য নিতান্ত মানবিক কারণে অসাধারণ হয়ে আছে। অন্তত মার্কসের জীবনে পিতার ভূমিকা আর মার্কসের অতিভাবপ্রবণ তীব্রসংবেদনশীল যন্ত্রণাময় মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তপ্ত ছবি আমাদের মুগ্ধ করে। জীবনের কটাই বা বছর তবু শরাহত পাখির মত তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় অস্থির মার্কসকে বুঝতে হলে পুত্রের স্বর্ণময় ভবিষ্যতে গভীর আস্থাশীল হাইনরিখের আশা-নিরাশার দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমাদের লক্ষ্য করতে হয়। মার্কসের বেদনাদিগ্ধ প্রতি চিঠির উত্তরে শঙ্কিত পিতার কখনো আর্ত আবেদন, কখনো যুক্তিবাদ, এমনকি কখনো কখনো তীব্র ভৎর্সনা সংবেদনশীল পাঠককে চমকে দেবে :

"I am disgusted with your letters—their irrational tone is loathsome to me. I would never have expected it of you. What cause can you have for them ? Weren't you child of luck from your very cradle ? Was not nature generous to you ? Haven't your parents loved you with a great love ? Was there ever a time when you could not satisfy the least one of your wishes ? Weren't you lucky to win the heart of a girl who is the envy of thousands ? And now the first step of opposition, the least discomfort brings forth your pessimism ? Do you call that strength or manly character ?"

সব সচেতন পিতার মতই হাইনরিখের আকাঙ্ক্ষা পুরুষকারের উপাদান নিয়ে পুত্রের জীবন গড়ে উঠুক। কেবল একান্তে মনে মনে পোষণ করে রাখা নয়, পুত্রের দুর্বলতায় আশঙ্কিতচিত্ত উপযুক্ত পিতা পুত্রকে ক্রমাগতই আঘাত দিয়ে চলেছেন। সুদৃঢ় চিত্তের এমন পিতার ব্যক্তিত্বের কাছে সব সন্তানকেই আপন দুর্বলতা প্রকাশ করতে হয়। পিতার কাছে যে মার্কস কতখানি নিরুপায় এবং পিতার উপর তাঁর নির্ভরশীলতা যে কত আন্তরিক, ঘটনাচক্রে বারবার তা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে হাইনরিখের এই ভৎর্সনাময় চিঠি পাওয়ার দিন কয়েক

আগে মার্কস বহু-আকাঙ্ক্ষিত ছোট্ট একটা চিঠি পেয়ে গেলেন। জেনীর চিঠি। এক বছর অদর্শনের পর বহু বিনিদ্র রজনীর একান্ত কামনার দু-ছত্র চিঠির অপরিসীম মূল্য পিতার কাছে মার্কস প্রকাশ করতে পেরেছিলেন :

"Her letter received. Give my best wishes to my sweet beautiful Jenny. I have reread her letter twelve times and every time I find new charm in it. It is in every respect, even in style, the finest letter that I have ever received from a lady."

তারুণ্য ও কাব্যচর্চা

জেনীকে দেখতে না পাওয়ার বেদনা আর কৈশোরশেষের রোমান্টিকতা মার্কসকে কিছুকালের জন্য কাব্যচর্চায় টেনে এনেছিল। সম্ভবত গোটা দুই বছর মার্কস কাব্যরচনায় মন দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কস রচিত সম্পূর্ণ কাব্য-সম্ভার এতাবৎ খুঁজে পাওয়া যায়নি বলেই বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য যে, পরবর্তী জীবনে মার্কস স্বরচিত কাব্য সম্পর্কে কোনোই কৌতূহল প্রকাশ করেননি। বার্লিনে মার্কস কাব্যচর্চার সঙ্গীও পেয়ে গিয়েছিলেন। বার্লিনের তরুণ কবিদের সমাবেশ: 'পোয়েটস কর্নার'। মার্কস তার নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলেন।

মার্কসের জীবনীকারেরা মার্কস-জীবনের এই পর্যায়কে খুব নিরুৎসুক দৃষ্টিতে দেখেছেন। অথচ মার্কস-জীবনের এই পর্যায়ের তাৎপর্য এই যে, কৈশোরোত্তর জীবনের স্বল্পকালীন কাব্যচর্চা মার্কসকে সারাজীবন এক আশ্চর্য কাব্যপ্রেমিক রূপে চিহ্নিত রেখে গেছে। কবি হাইনে ও ফ্রাইলিগ্রাথ দীর্ঘকাল মার্কসের অন্তরঙ্গ সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন, এমনকি মার্কসের কাছে কাব্যরচনা সম্পর্কিত পরামর্শও তাঁরা নিয়েছেন। বিশ্ব সাহিত্যের সেরা কাব্য নিদর্শনগুলি মার্কস চিরকাল তাঁর আশ্চর্য স্মরণশক্তিতে উজ্জীবিত রেখে-ছিলেন। তরুণ বয়সের কাব্য রচনার মধ্যে ভবিষ্যৎকালের দার্শনিক মার্কসকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।

মার্কসের কাব্যচর্চায় পিতা হাইনরিখের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। হাইনরিখ যথার্থই মনে করতেন, 'পোয়েটস কর্নার'-এ তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সংসর্গ মার্কসের সুস্থ মানসিক পরিণতির সহায়ক হবে, সম্ভবত কৈশোর-তারুণ্যের বয়ঃ-সন্ধিকালের অস্থিরতার নিবৃত্তি ঘটবে। একাধিক চিঠিতে হাইনরিখ পুত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করেছেন। মার্কসের রচনা পাঠ করে যথাযথ মন্তব্য সহকারে এমনও বলেছেন: "মাত্র একজন গৌণ কবির ভূমিকায় জনসমাজে তোমার আবির্ভাব ঘটবে—এ ব্যাপার আমার কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক।"[১]

১ John Spargo: Karl Marx, Life and Times, 1910

জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রই হোক না কেন মার্কসকে তার পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—মার্কসের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকিয়ে মার্কস-পিতার এই যথার্থ দাবি পুত্রকে পরিণত মনের সন্ধান দিতে পেরেছে বলেই মনে হয়। কেননা কাব্যের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা থেকে যে মননের জন্ম, পরবর্তীকালে মার্কসীয় চৈতন্য তাবৎ বিশ্বের জীবনযাত্রা ও মানুষের ভবিষ্যৎকে মননের সেই সূক্ষ্মতায়, সম্পূর্ণতায় শ্রীমণ্ডিত করে যে আশ্চর্য জীবনের মহাকাব্য রচনা করে রেখেছে, আঠারো বছরের অস্থিরচিত্ত তরুণ কবির রচনাতেও তার যৎকিঞ্চিৎ স্পর্শ পাওয়া যাবে।

অনেক আধুনিক কবির মতই মার্কসের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল : "Everything was centered on poetry as if I were bewitched by some earthly power."—এই ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন মার্কসকে অজস্র কবিতা রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুরূহ পাঠ্য বিষয় থেকে ক্ষণিক মুক্তির আনন্দের স্বাদ বয়ে আনত কবিতা রচনার চেষ্টা। মার্কসের কাছে কবিতা তখন কেবল চিত্তবিনোদন নয়। দুরূহ পাঠ্য বিষয় বুঝি ছিল মহৎ কবির প্রস্তুতির উপাদান মাত্র—কবিতা রচনাই বুঝি জীবনকর্ম। জীবনের প্রকাশের ধর্ম। সেই স্বপ্রকাশের বেদনা থেকে মার্কসেরও মুক্তি ছিল না। মহত্তর কবিকুলের সৃষ্টির আলোকে মার্কস নিজের রচনার তুলনা করে চোখের জল ঝরিয়েছেন। স্বীকৃতিতে ব্যর্থতার বেদনার প্রকাশ : "The riches of true poetry dazzled me and turned all my hopes to naught."

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাসকালে পিতা হাইনরিখের উপদেশ ছিল দূরত্বজনিত দীর্ঘ বিচ্ছেদে, অদর্শনে জেনীর প্রতি মার্কসের আকর্ষণের পরীক্ষা হয়ে যাবে। কিন্তু বার্লিন রওনা হওয়ার অভিমুখেই মার্কস পরীক্ষা দিতে শুরু করেছেন। তখন থেকেই পরিবর্তিত মনের হিসেব আমরা নিতে পারি। কেননা এই মনের সৃষ্টিবেদনার প্রাথমিক উপাদান সরবরাহ করেছেন জেনী। পিতা হাইনরিখকে লেখা চিঠিতে অস্থিরচিত্ত তরুণ মার্কসকে আমরা খুঁজে পাব—যার তারুণ্য নবীন হৃদয়ের সৃজনশীল বেদনায়, আগামী মহাজীবনের বন্দনায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে :

"যখন আমি তোমাদের ছেড়ে এলুম—আমার অস্তিত্বের কাছে এক নতুন

জগৎ ধরা দিল। এক অর্থহীন ভালবাসার জগৎ—যাতে কেবল না পাওয়ার বেদনায় মাতাল হয়ে ছিলাম। এমনকি অন্য পরিবেশে, এই বার্লিন যাত্রাপথে নতুন পরিচয়ের, নতুন জীবনের আনন্দের স্বাদে উন্মত্ত হতে পারতুম, তা আমাকে নিরুত্তাপ রেখেছে; সম্ভবত এক অস্বস্তিকর বিদ্রূপের মধ্যে রেখেছে—কেননা যাত্রাপথের দৃশ্যমান পর্বতরাজিকে দেখে মনে হয়েছে আমার মানসিক অস্থিরতা এদের চেয়েও বন্ধুরতর, এদের চেয়েও উদ্ধত-দুর্বিনীত; বিস্তৃত নগরগুলিকে মনে হয়েছে আমার উন্মত্ত রক্তের চেয়েও স্তিমিত; সরাইখানার টেবিলের ভিড় আমার মনের দুঃস্বপ্নের ভিড়ের চেয়েও বুঝি পাতলা; এবং কোনো শিল্পই জেনীর চেয়ে সুন্দরতর নয়।"

পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দিয়ে অশান্ত হৃদয় কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে এসে ঘোষণা-মুখর: "কোনো শিল্পই জেনীর চেয়ে সুন্দরতর নয়"। সকল দেশের কবিকণ্ঠেই এমনতরো আশ্চর্য বিষণ্ণ বিচ্ছিন্নতাবোধ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। কবি স্বভাবতই এই বিচ্ছিন্নতাবোধের জনক, এই অস্ফুট কবিকণ্ঠ আমাদের কবি-সার্বভৌমের বিষণ্ণ মধুর সৃষ্টিতেও অনুরণিত: "একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান"। আমাদের উল্লিখিত তরুণ কবির একটি রচনার মর্মানুবাদ সার্বজনীন কবিহৃদয়কে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করবে:

"হৃদয় যদি শৃঙ্খলিত কঠিন বন্ধনে,
দেখ মনের দুচোখে জ্বালি রৌদ্র-ইশারা;
বৃথাই খুঁজে মরি, আহা ব্যর্থ হতাশায়,
তোমায় কাছে পেয়ে একি খোঁজার পালা সারা!

অন্ধকারে হঠাৎ নেভে আলোর রোশনাই,
বিষাদে মন মানছি আমার ভাগ্য পলাতক।
দেখি কখন অনাহূত স্বাগত আহ্লাদে,
তোমার দুই চোখে নাচে চিরকালের সখ!"

সহোদরা সোফি মার্কসকে চিঠি দিয়ে জানালেন: "তোমার কবিতাগুচ্ছ পড়ে জেনীর দু'চোখে আনন্দাশ্রু"।

তরুণ মার্কসের ষাটখানি কবিতা খুঁজে পাওয়া গেছে। রচনাকাল, ১৮৩৬-৩৭। মার্কস কেবল গীতিকবিতাই লেখেননি, জীবনানুভূতির বিচিত্র

স্বাদের একাধিক কবিতা থেকে দর্শনের তরুণ ছাত্র মার্কসকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না। তরুণ বয়সের কাব্যকলা আর পরবর্তী জীবনের দুরূহ দর্শন-চিন্তা দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ অলক্ষণীয় নয়। কাব্যের বিষয়বস্তু, রচনার স্টাইল, রূপক, উপমা ও অলংকারের বাহুল্য, ইঙ্গিতে উল্লেখ, ইত্যাকার কাব্য-উপাদান মার্কসের ষাটখানি কবিতায় অনবদ্যভাবে ছড়ানো—এইসব উপাদানই ভবিষ্যতের চিন্তানায়ক মার্কসকে চিহ্নিত করে দেয়।

মার্কসের কবিতার মধ্যেই তৎকালীন সন্ধানী-মন দার্শনিককে খুঁজে পাওয়া যাবে। কাণ্ট, ফিকৃটে ও হেগেল-এর দর্শন বিচারের অরণ্যে পথ খুঁজে খুঁজে পরাজিত না হওয়া দার্শনিকের সন্ধান পাব :

> "অদৃশ্য ইথারে ভেসে কাণ্ট, ফিকৃটে কোন্ এক
> দূরদেশের সন্ধানে ঘুরে মরছেন, আর আমি
> এই সমুখের পথে
> কী পেলাম, তাকেই বোঝার চেষ্টায় রত।"

ইথারীয় চেতনা বা দূরদেশের অজ্ঞাতকে মার্কস ব্যঙ্গ করছেন না। মাটির পৃথিবীকে উপেক্ষার ভান তখনই মার্কসের কাছে অসহনীয়—জগৎ ও জীবনের পরিবেশ থেকে যখন মুক্তি নেই তখন চিন্তার চূড়ান্ত অ্যাবস্ট্রাক্‌শন থেকেই ইহজগতের মুক্তি, ইহজগতের লাভালাভ সংগ্রহ করার চেতনা কবি-কর্মের মধ্যেও মার্কস জারিত করেছেন :

> "কেননা আমি সর্বোচ্চ মহিমার আবিষ্কারক এবং
> গভীরতায় অতলস্পর্শের স্বাদ পেয়েছি,
> বেদনায় ছিন্নভিন্ন হয়েছি।
> আমি ঈশ্বরের মতই অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারি।
> বহুকাল চিন্তার সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে
> যে শব্দব্রহ্মের সন্ধান পেলুম,
> তাকে আমি
> হাতছাড়া করছি না।"

এই কাব্যাংশে অ্যাবস্ট্রাকশন যতটা উপভোগ্য, তার সঙ্গে তুলনীয় ঈশ্বর, চেতনা ও মানুষের নিরাকার ঐক্যের চমকপ্রদ ব্যঙ্গটিও। দর্শনবিচারকে উপলব্ধির গভীরতায় কাব্যের শরীরে উপস্থাপনা নিপুণ মুন্সিয়ানায় সম্ভব

হয়েছে। আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে মৌল সত্তা রয়েছে—যাকে আমরা বলি ধ্যানীসত্তা—এই ধ্যান-স্বরূপের সাধনা বুদ্ধি দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, বস্তু-চেতনার জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করানো সৎ কবিকর্মের কৃতিত্ব। বস্তুচেতনার জ্ঞান দিয়ে যখন বস্তুর অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত কোনো বিশেষকে ধরার চেষ্টা হয়—সীমার মধ্যে অসীমকে না খুঁজে উল্টোটাই যখন কবিকর্মের লক্ষ্য হয়—অন্তহীনের আড়ালে দুর্নিরীক্ষ্যকে খুঁজে দেখার হয় চেষ্টা—তখন কবি-মন কুণ্ঠাহীন ভাষায় দূর আকাশে নক্ষত্রের মধ্যে মোহময় কিছু খুঁজে না পেয়ে বলতে পারেন :

> "অগ্নিময় আলোকশিখার ভৌতিক অবস্থিতি
> মাত্র। তোমার না আছে হৃদয়ের আগুন,
> সমবেদনা কিংবা মন।"

বলা চলে, অসীমের মধ্যে সীমার সন্ধানের এই উল্টো রীতি মার্কসকে বিশ্বের সর্বোত্তম মানবিক দর্শনের প্রবক্তা করেছে—হয়তো সর্বোত্তম কাব্যসৃষ্টিতেও উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। উত্তরকালের পরিণত মার্কসকে তাঁর কবিতাগুচ্ছের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

কাব্যচর্চার শেষ পর্যায়ে মার্কস একটি উপন্যাস রচনায় মন দেন—অসমাপ্ত রচনা, নাম 'Skorpion and Felix'। এর পরেও একটি ট্রাজেডি রচনায় হাত দিয়েছিলেন, নাম 'Oulanem', তাও শেষ করতে পারেননি। কাব্যের সঙ্গে দর্শনচর্চা একই সঙ্গে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মার্কস দর্শনের দিকেই পুরোপুরি ঝুঁকে পড়লেন।

দার্শনিক জীবনের সূত্রপাত

বার্লিনে মানসিক দ্বন্দ্বে মার্কস যখন অস্থির হয়ে উঠেছেন এমন সময়ে পরিচয় হোল তরুণ হেগেলপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে। মার্কসের জীবনে দিক্ পরিবর্তনের সূচনা এখান থেকেই। যে মার্কসকে আজ তাঁর জীবনের দেড়শো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও পৃথিবী অতি আদরের সঙ্গে মনে রেখেছে, সেই সংগ্রামী সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিক মার্কসের আধ্যাত্মিক জন্মের মহালগ্ন এল।

গোড়ার কথা কিছুটা বলতে হয়—কেননা মার্কসের যাত্রা হেগেলের দর্শন থেকে। বার্লিনে হেগেলপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন ছিল Doktorklub। র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তরুণ বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হতেন এখানে। হেগেলের শিষ্য বলেই নিজেদের ওঁরা পরিচয় দিতেন।

শুধু এই তরুণ বুদ্ধিজীবীরা নয়, প্রায় সমস্ত জার্মানীই তখন হেগেলীয় দর্শনে প্রভাবিত। হেগেলের দর্শনকে জার্মান সরকার রাষ্ট্রীয় দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তখনকার জার্মান সরকারের সমর্থনে হেগেল বলেছিলেন, এই সরকারের কার্যাবলী যুক্তিসংগত, কারণ তার অস্তিত্ব রয়েছে। আর অস্তিত্ব যখন রয়েছে তখন বুঝতে হবে তার পেছনে রয়েছে অপরিহার্যতা বা প্রয়োজনীয়তা। যদি এর কার্যাবলী অযৌক্তিক হোত, তবে এই সরকার নিশ্চয়ই লোপ পেত। যতক্ষণ না এর বিলুপ্তি ঘটছে, বুঝতে হবে এর কার্যাবলী অযৌক্তিক নয়—সঠিক পথেই এই সরকার পরিচালিত হচ্ছে। হেগেলের দার্শনিক অনুজ্ঞার অংশ বিশেষ সরকারী কাজের সমর্থনে সুযোগমত লাগিয়ে জার্মান রাজতন্ত্রের সমর্থক জমিদারতন্ত্র ও সেনেট সরকারের দমননীতির একটা স্থায়ী ব্যাখ্যা তৈরী রাখলেন।

হেগেলের দর্শনের এই রক্ষণশীল দিক্টাই ব্যাবহারিক মর্যাদা পেল। প্রচলিত অবস্থাকে দর্শনের পদ্ধতি দিয়ে সমর্থন করে হেগেল জার্মান রাজতন্ত্রকে বাঁচবার হাতিয়ার জুগিয়েছেন। কিন্তু হেগেলীয় দর্শনের গতিময়তার দিক্ রক্ষণশীলদের কাছে পরিত্যক্ত ছিল। কেননা হেগেল আরো বলেছিলেন যে, এক সময়ে বাস্তব অবস্থা অবাস্তব হয়ে যেতে পারে—তখন তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। এমনি ভাবে বিলুপ্ত হয়েছে ফরাসী রাজতন্ত্র—ফরাসী রাজতন্ত্রের যতদিন

অস্তিত্ব ছিল তার অস্তিত্বের পেছনে যুক্তি ছিল। কিন্তু গতির পথে রাজতন্ত্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো এবং তার অস্তিত্ব যুক্তিহীন হয়ে গেল—যার ফলে রাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পতন হোল। সুতরাং হেগেলের মতবাদ থেকে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বর্তমানে যার অস্তিত্ব আছে গতির পথে একদিন না একদিন তার স্থায়িত্ব লোপ পেতে পারে।

হেগেলের দর্শনের মধ্যে স্পষ্ট দুটো ধারা দেখা যাচ্ছে। একটা ধারায় দেখি বাস্তব অবস্থা যে কোনো উপায়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। অপরদিকে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে জগৎ-সংসারের গতিময়তার ব্যাখ্যা স্বীকার করা। তাঁর দর্শনের এই দু'দিক শিষ্যদের মধ্যেও বিভেদ রচনা করেছিল। রক্ষণশীল শিষ্যেরা শ্রেণীগত স্বার্থে রাষ্ট্রের প্রচলিত রাজনীতির পক্ষে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করলেন। এঁরা রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার সমর্থন করে এসেছেন। কিন্তু তরুণ হেগেলপন্থীদের মধ্যে জন্ম নিল নাস্তিকতা ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। বার্লিনে এঁদেরই নেতা ব্রুনো বাউয়ের (Bruno Bauer), কার্ল ফ্রায়েডরিশ কোপ্পেন (Karl Friedrich Koppen), ডেভিড ফ্রায়েডরিশ ষ্ট্রউস (David Friedrich Strauss) ও লুডভিগ ফয়েরবাখ (Ludwig Feuerbach)। জার্মান রক্ষণশীলতার যথাযথ বিরোধিতা এল এঁদের কাছ থেকেই।

প্রথম ধাক্কা দিলেন ষ্ট্রউস। যিশুর জীবন নিয়ে ষ্ট্রউস একটা বই[১] লিখলেন (১৮৩৫)। যিশুর জীবনের লোকোত্তর মহিমা ষ্ট্রউসের কলমে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। হেগেলের দার্শনিক প্রতিপাদ্য থেকে ষ্ট্রউস তাঁর সমর্থন নিয়েছেন। বাইবেলের গালগল্পের অলৌকিকত্ব হেগেলও সমর্থন করেননি, কেননা ঈশ্বরই যখন চরম ও পরম, সেই পরম ভাব (অন্য অর্থে ঈশ্বর) থেকেই আমাদের সাময়িক কালের বাস্তব ও ভবিষ্যতের বাস্তবের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। তাঁর মতে বিশ্বের সৃষ্টির বহু আগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল শুদ্ধ চিন্তার (Pure Thought) রূপে। ঈশ্বর শুদ্ধ চিন্তা দিয়ে বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি করেছেন—শুদ্ধ চিন্তা যেমন শাশ্বত চিরন্তন, বিশ্বের অস্তিত্বও শাশ্বত চিরন্তন, কেননা ঈশ্বরের আপন শাশ্বত সত্তা দিয়ে এই বিশ্ব সৃজিত। এই যে ঈশ্বরের ধারণা, বাইবেলীয় ঈশ্বরের সঙ্গে এই ধারণার সংঘাত

১ *Das Leben Jesu*

অবশ্যম্ভাবী। সেই অবশ্যম্ভাবী সংঘাতের ইঙ্গিত হেগেলই দিয়ে গেছেন। অতএব ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে বাইবেলীয় গালগল্পের যোগাযোগ অহেতুক। কোনো বিশেষ পার্থিব ঘটনা দিয়ে ঈশ্বরের অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয় না, কেননা ঘটনা-প্রবাহের চিরন্তনতার ও সামগ্রিকতার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রকাশিত হচ্ছেন। ঈশ্বরই সব ঘটনার আদি উৎস।

অবশ্যই ঈশ্বরের পরমত্ব মেনে নিলে বাইবেলের গালগল্প অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই অর্থহীনতার যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিত হেগেলই দিয়ে গেছেন। স্ট্রউস হেগেলের পদ্ধতি অনুসরণ করে যিশুর মহিমাকে লৌকিক পর্যায়ে টেনে আনলেন। যিশুকে বললেন ঐতিহাসিক পুরুষ। বাইবেলের বর্ণিত ঘটনাগুলোকে ঐতিহাসিক ঘটনায় নামিয়ে আনলেন। বাইবেল এবং যিশুর অলৌকিক মহিমার পদচ্যুতি ঘটালেন। স্ট্রউসের সিদ্ধান্ত মৌলিক কেননা হেগেল যেখানে বলেছিলেন ঈশ্বর থেকেই শুরু, স্ট্রউসের প্রতিপাদ্য বক্তব্য মানুষের চিন্তা থেকেই ঈশ্বরের জন্ম। স্ট্রউসের বক্তব্যকে পরে আরো বৈপ্লবিক এবং আরো ঘনিষ্ঠ লৌকিক মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন ব্রুনো বাউয়ের ও লুডভিগ ফয়েরবাখ। সে কাহিনী আরো কয়েক বছর পরেকার।

স্ট্রউসের বই সমস্ত জার্মানীর চিন্তাবিদ্ মহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুললো। বইটি প্রকাশিত হবার পর দুটো ঘটনা স্মরণে রাখা দরকার। প্রথম হচ্ছে হেগেলের নিজস্ব দার্শনিক পদ্ধতি দিয়েই হেগেলের প্রতিপাদ্যের খণ্ডন। দ্বিতীয়ত, এই বই তরুণ হেগেলপন্থীদের একটা সংহতির মধ্যে বেঁধে দিল। দক্ষিণপন্থী হেগেলীয়দের ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত রক্ষণশীলতার দুর্গে আঘাত দেবার সুযোগ করে দিল। দুটো বিরোধী এবং আক্রমণাত্মক শিবিরে ভাগ হয়ে গেলেন হেগেলের শিষ্যেরা।

প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির বিরোধিতায় যখন তরুণ হেগেলপন্থীরা তাঁদের বক্তব্যে শান দিচ্ছেন তখনই মার্কস এসে পড়লেন তরুণ হেগেলীয়দের সংগঠনে। এই সংগঠনের নেতৃপদে ছিলেন বাউয়ের, কোপ্পেন। দলে ছিলেন রুটেনবার্গ, এডুয়ার্ড মেয়েন, ম্যাক্স স্টার্নার। আরো যাঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই বার্লিনের শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেউ অধ্যাপক, শিক্ষক, কেউ পত্রিকা সম্পাদক। মার্কসের মত তরুণ ছাত্রেরাও ছিলেন দলে।

রাজতন্ত্রের পক্ষে স্ট্রউস ছিলেন নিরাপদ। ধর্মতত্ত্বের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দিলেও

ধর্মতত্ত্বের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসেননি। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ষ্ট্রউসের আলোচনার বাইরে ছিল। কিন্তু একই হাতিয়ারে রাজনীতি ও সমাজনীতির বৈপ্লবিক ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হলেন বাউয়ের ও কোপ্পেন এবং সঙ্গে নিলেন মার্কসকেও। আর্নল্ড রুগে (Arnold Ruge) ও থিয়োডোর এখটেরমেয়ের (Theodore Echtermeyer) যুগ্ম সম্পাদনায় তরুণ হেগেলীয়দের মুখপত্র বার করলেন। মুখপত্রটির নাম : Halliesche Jahrbucher fur deutsche Kunst und Wissenschaft[১]। পত্রিকাটি জন্ম মাত্রই প্রচলিত রাজনীতি ও সমাজনীতির বিরোধিতা শুরু করলো। বাউয়ের ও কোপ্পেনের সঙ্গে মার্কসও ওই সংকলনে লেখা শুরু করলেন।

বার্লিন বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করতেন বাউয়ের, মার্কসের চেয়ে দশ বছরের বড়, কিন্তু পরিচয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বাউয়ের মার্কসের মনীষার যথাযথ পরিচয় পেলেন। বিশ বছরের এই ছাত্রটিকে তখনি দলের নেতৃত্বের মর্যাদাও দিতে হয়েছিল। অথচ এই বাউয়ের প্রথমদিকে ছিলেন রক্ষণশীল হেগেলপন্থী, ষ্ট্রউসের যিশুর জীবনীর বিরূপ সমালোচনায় বাউয়ের ছিলেন অগ্রণী। এই তরুণ দক্ষিণপন্থী হেগেলশিষ্য রক্ষণশীলদের অনেক আশা ভরসার স্থল ছিলেন। কিন্তু কয়েকবছর বাদেই বাউয়েরের চিন্তাজগতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। বাউয়ের পরিণত হলেন চরমপন্থী হেগেলশিষ্য। বাউয়েরের এই মানসিক বিবর্তনের মুখেই মার্কসের সঙ্গে পরিচয়—বাউয়ের তখন চরমপন্থীদের নেতা। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ষ্ট্রউসকেও অতিক্রম করে গেলেন বাউয়ের খৃষ্টতত্ত্বের আলোচনায়। খৃষ্টীয় গসপেলের আরো কঠিন সমালোচনায় বাউয়ের তৎপর হয়ে উঠলেন। বাউয়ের বললেন, বাইবেলীয় গল্পগাথার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তিই নেই। ওগুলো নিছক গল্প। খৃষ্ট ধর্মের উৎপত্তি অবশ্য ঐতিহাসিক কারণে ও সামাজিক প্রয়োজনে। ঈশ্বরের বা যিশুর কোনো লোকোত্তর মহিমা তার হেতু নয়।

বাউয়েরের বই বেরুল Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes (1840)।[২] শিক্ষাজগতের কর্তৃপক্ষের নজরে পড়লেন

---

১ Halle Yearbook for German Art and Science

২ পরের বছর বাউয়ের-এর খৃষ্টতত্ত্ব প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বই বেরোয় Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker

বাউয়ের। বাউয়েরকে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরিয়ে দেওয়া হোল। বাউয়েরের সঙ্গে মার্কসের ঘনিষ্ঠতার মুখে বাউয়ের বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হলেন। মার্কস রয়ে গেলেন বার্লিনে। বাউয়ের চলে গেলেন কিন্তু বাউয়ের চান মার্কসও পড়াশুনো শেষ করে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করুক। বন থেকে দুজনে মিলে একটা র‍্যাডিক্যাল মতামতের সাময়িক পত্র বার করবেন। Halle Yearbook দুজনকে যথাযথ খুশি করতে পারছিল না। কিন্তু তার আগে মার্কসের পড়াশুনো শেষ করা দরকার। তবে মার্কসের ডক্টরেট থিসিস তাঁর পরীক্ষকদের কতখানি খুশী করতে পারবে সে সম্পর্কে বাউয়েরের সন্দেহ ছিল।

মার্কসের চূড়ান্ত র‍্যাডিকাল মতামত, নাস্তিকবাদ পরীক্ষকদের খুশী করতে পারবে না নিশ্চয়, অথচ ডক্টরেট না পেলে নয়। বাউয়ের-এর ইচ্ছে মার্কস যেন তাঁর মতামতের সুর কিছুটা নরম করে আনেন যাতে রক্ষণশীল পরীক্ষকদের কাছে ওই গবেষণা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু দার্শনিক মতামতে মার্কস নিজস্ব প্রত্যয় থেকে একচুলও নেমে আসতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস তাঁর গবেষণা পরীক্ষার জন্য দেবেন না। মার্কসের মতামতের চূড়ান্ত বিরোধীরাই সেখানে পরীক্ষক। অন্য এক অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসকে যেতে হবে যেখানে মার্কসের যুক্তিবাদ ও প্রত্যয় যথাযথ মূল্য পাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল জেনা বিশ্ববিদ্যালয়। পনেরো এপ্রিল, ১৮৪২, মার্কস জেনা থেকে স্নাতকোত্তর গবেষণার পুরস্কার পেলেন।[১]

মার্কসের বিষয় ছিল ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য। মূলত ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মের ভূমিকাই নব্য হেগেলবাদী মার্কসকে বস্তুবাদী গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করে। হেগেলবাদে দার্শনিক অনুভাবনা ও ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে নব্য হেগেলবাদীদের তাই ছিল বিতর্কের বিষয়। সম্পূর্ণ বস্তুগত ধারণায় ঈশ্বরকে নামিয়ে আনার চেষ্টা য়ুরোপে প্রথম দেখা যায় ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের চিন্তায়।

---

১ মার্কসের গবেষণার বিষয় ছিল: Differenz der demokritishen und epikureischen Naturalphilosophie—ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য

১৮৩৭ সালে পিতা হাইনরিখকে একটা চিঠির বক্তব্যে মার্কস জানাচ্ছেন : "দেবতাদের অধিষ্ঠান এতদিন ছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে, এখন তাঁরা বাস করেন পৃথিবীর মধ্যেই।" যেকালে মার্কস এ কথা লিখেছেন, স্ট্রউস লিখিত যিশুর জীবনী নব্য হেগেলবাদীদের সেই সময়ে একটা মূল চিন্তাধারায় সংহত করতে পেরেছে। বিশেষ করে ধর্মের অলৌকিক তত্ত্বে আঘাত হানবার ঐক্যবদ্ধ সুযোগ এনে দিয়েছে। উনিশ শতকের ভাববাদী চিন্তাধারায় ফাটল ধরাবার এই চেষ্টা মার্কস আরো বিস্তৃত করে দেখাতে চাইলেন তাঁর গবেষণায়। নব্য হেগেলবাদীরা যখন নিছক ধর্মতত্ত্বের মধ্যে ডাইলেকটিক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগে মগ্ন রয়েছেন মার্কস তখন চূড়ান্ত বস্তুবাদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের সংযোগ ও বিরোধিতার ব্যাখ্যা রচনায় মন দিলেন। আর, স্বাভাবিক কারণেই বস্তুবাদের মৌলিক স্রষ্টাদের দিকে মার্কসের দৃষ্টি পড়ল। দৃষ্টি পড়ল গ্রীক বস্তুবাদের দুই উদ্ভাবক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনে।

ডিমোক্রিটাস বলেছেন, শূন্য থেকে কোনো কিছুর উৎপত্তি হতে পারে না (Nothing is created out of nothing)। কোনো কিছুই একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় না—এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তর লাভ করে। বিনা কারণে ও প্রয়োজনে কোনো কিছুই ঘটে না। আদিতে রয়েছে পরমাণু। পরমাণু থেকেই জগতের সব কিছুর উৎপত্তি। পরমাণু সকল সময়ে গতিশীল। তবে পরমাণুর গতির পেছনে প্রকৃতিগত কারণ রয়েছে—পরমাণুর সব কিছুই প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু পরমাণু দ্বারা মানুষের জীবন গঠিত— মানুষের জীবনও প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছা নেই—মানুষেরও স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

এপিকিউরাস এই পরমাণুবাদ গ্রহণ করলেও বিপরীত ভাবে পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আরো দেখিয়েছেন যে, মানুষের জীবন স্বাধীন ও স্ব-ইচ্ছায় চালিত। প্রকৃতির অনড় ও অবিকল নিয়মের ক্রীড়নক হিসেবে তিনি মানুষকে দেখেননি। মানুষ আপন ইচ্ছায় জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারে।

ডিমোক্রিটাস পরমাণু দিয়েই ঈশ্বর ও বিভিন্ন দেবদেবীর রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের মত দেবতারাও পরমাণু দিয়ে তৈরী। দেবতাদেরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। সাধারণ লৌকিক ক্ষমতা ও কার্যকারণের কিছু ঊর্ধ্বে

দেবতাদের অধিষ্ঠান। ডিমোক্রিটাসের প্রত্যয়ে ধর্মতত্ত্বের লোকোত্তর মহিমা স্বীকৃত নয়।

ডিমোক্রিটাসের ধর্মতত্ত্বের এই ব্যাখ্যার কিছু অংশ এপিকিউরাস গ্রহণ করেছেন কিন্তু এই ব্যাখ্যাকে আরো ঘনিষ্ঠ লৌকিক মর্যাদা দিয়েছেন। এপিকিউরাস বলতে চেয়েছেন দেবতারা মানুষের কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। দৈব, ঈশ্বরের বিধান এই সব ধারণা কুসংস্কার মাত্র। ভগবান বিশ্ব বা মানুষকে সৃষ্টি করেননি। বিশ্বজগৎ এবং মানুষের কোনো কাজের উপর ভগবান হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং, ভগবানকে ভয় বা ভক্তি করার কোনো কারণ নেই মানুষের। মানুষের ইচ্ছা ভগবানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত নয়—প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও তা মুক্ত। প্রাকৃতিক সীমার বাইরে মানুষ আপন ভাগ্যবিধাতা।

মানুষের স্ব-ইচ্ছার পরবশ্যতা বা জড়ত্ব মার্কসের কাছে স্বীকৃত তথ্য নয়। মার্কসের কাছে মানুষ চিরকালই আপন ভাগ্যবিধাতা। এই কারণেই নানা প্রসঙ্গে ডিমোক্রিটাসের প্রতি বিরূপ মন্তব্যে মার্কসের উৎসাহ দেখা গেছে। তুলনায় এপিকিউরাস মার্কসের প্রত্যয়ে আরো গ্রহণযোগ্য। যে সময়ে এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত যে, দেবতা বা ঈশ্বর মানুষের ভাগ্যের সিঁড়ি তৈরী করে দেয়, সেই কালে মার্কস প্রচণ্ড ঘৃণা ছড়িয়ে বলছেন, "যত দেব দেবী আছে সকলকেই আমি ঘৃণা করি"। গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকার একাংশে মার্কসের এই উক্তি।

ধর্মতত্ত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা থেকে মার্কস সরাসরি চলে এসেছেন বস্তু জগতের প্রগতিবাদে, যেখানে মানুষ স্বয়ং আপন ভাগ্যনির্মাতা। এ ব্যাপারে মার্কস কিন্তু হেগেলীয় ডায়েলেক্‌টিক্‌সের সাহায্য গ্রহণ করেননি। মোটামুটি, বস্তুবাদী ডায়েলেক্‌টিক্‌সের রীতি নীতি মার্কসকে আপন ব্যাখ্যায় যুক্তি জুগিয়েছে। একেবারে নিজস্ব পন্থায় মার্কস বলতে চেয়েছেন, ধর্ম নয়, ঈশ্বর নয়, দর্শন থেকেই মানুষ আপন ভাগ্য পরিবর্তনের রসদ জোগাড় করে নেবে। দর্শন থেকেই আসবে বাস্তব জগৎ সম্পর্কিত ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী—যার শক্তিতে মানুষ জীবন ও জগৎকে প্রয়োজন মত বদলে নিতে পারবে। মনোগত চেতনা থেকে জন্ম নেবে জাগতিক বিদ্রোহ। দর্শন যেন পুরাণের প্রমিথিয়ুস, স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষের জীবনে বিপ্লব এনে দেবে—গবেষণা গ্রন্থের মুখবন্ধে মার্কস বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের এই উল্লেখ রেখেছেন। কিন্তু

তখন কে জানতো—মার্কস নিজেই আধুনিক কালের প্রমিথিয়ুস, পুরাণের প্রমিথিয়ুসের মত যিনি দুরন্ত ভাগ্য জয় করার চিরকালীন হাতিয়ার মানুষের হাতে তুলে দেবেন।

সম্ভবত তরুণ মার্কসের এই ভবিষ্যৎ চিনেছিলেন একজন। নব্য হেগেলপন্থী মোসেস হেস। মার্কসের তরুণ বন্ধু। মার্কসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা হেস তাঁর আর এক র‍্যাডিক্যাল বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। মার্কস তখন সবে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। চব্বিশ বছরের যুবক মার্কসের মুখোমুখি পরিচয় পেয়ে হেস বিস্মিত। তাঁর চিঠির ইংরেজী অনুবাদ থেকে পাই :

"He is the greatest, perhaps the one genuine, philosopher now alive and will soon......draw the eyes of all Germany... Dr. Marx—that is my idol's name—is still very young (about 24 at most) and will give mediaeval religion and politics their coup-de-grace. He combines the deepest philosophical seriousness with the most biting wit. Imagine Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine and Hegel fused into one person—I say fused, not thrown together in a heap and you have Dr. Marx।"

মার্কসের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ হোল। কিন্তু কতকগুলো ঘটনা ইতোমধ্যে ঘটে গেল যা প্রত্যাশিত ছিল না। বাউয়ের-এর দ্বিতীয় বই 'Kritik der evangelischen Geschicte der Synoptiker' প্রকাশিত হয় এ সময়ে। একে ত সরকারী শিক্ষা দপ্তরের সুনজরে বাউয়ের ছিলেন না, এই বই শিক্ষা দপ্তরের রোষ আরো বাড়িয়ে দিল। বন থেকে বাউয়ের-এর চাকরি গেল। জার্মানীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী দমন নীতির খড়্গ নেমে এল। বাউয়ের-এর শুধু চাকরি গেল না, তখনকার জার্মানীর আইন মত তাঁর শিক্ষক-অধিকারও (teaching license) কেড়ে নেওয়া হোল। ফলে, শুধু বাউয়ের নয়, মার্কসও চোখে অন্ধকার দেখলেন।

মার্কসের সামনে একটাই পথ খোলা রইলো, ভবিষ্যতের পথ—সাংবাদিকতা। ছাত্রজীবনে সাংবাদিকতায় মার্কসের দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

আর্নল্ড রুগের সম্পাদনায় বেরুত 'Hallesche Jahrbucher'। নব্য হেগেলপন্থীদের মুখপত্র। তরুণ মার্কসের প্রাবন্ধিক জীবনের স্বরু এই পত্রিকাতেই। ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় পত্রিকাটি বিস্তর শোরগোল তুলেছিল— নব্য হেগেলবাদের দৃষ্টিতে ধর্মের আলোচনা। স্বভাবতই এঁদের প্রকাশিত আলোচনা সরকারী হেগেলবাদীদের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ ঘটায়। প্রাশিয়ান সরকার রচনাগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার গন্ধ পেল। অতএব পত্রিকার আয়ু বেশিদিন নয়। জন্মের আড়াই বছর বাদে পত্রিকার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল।

কিন্তু রুগে এত সহজে দমবার পাত্র নন। রুগের পেছনে রয়েছেন বাউয়ের, মার্কস, কোপ্পেন, হেস, কবি হাইনে—নবযুগের জার্মানীর প্রাবন্ধিক ও কবিরা। লিপজিগ থেকে বেরুত ওই পত্রিকা। এবারে রুগে ড্রেসডেনে চলে গেলেন। আরেকটি সাময়িক পত্রের জন্ম দিলেন। 'Deutsche Jahrbucher'। ঘা খেয়ে রুগে আরো র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বী হয়েছেন। নতুন পত্রিকা স্বমত প্রকাশে সরকারবিরোধী রূপ প্রকটতর করেছে। মার্কস খুশী এতে। কেননা মার্কসের মন ক্রমশ সামাজিক অন্যায় ও দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হয়ে উঠছে। মার্কসের একাধিক আলোচনা 'ডয়েশে ইয়ারবুখের'-এ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু জন্মমুহূর্তেই কর্তৃপক্ষের খরদৃষ্টি পড়েছিল পত্রিকার উপর। বছর ঘুরতে না ঘুরতে পত্রিকার প্রকাশ প্রাশিয়ান সরকার বন্ধ করে দিলেন।

একটা কি দুটো পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে নতুন যুগের চিন্তাধারা রোধ করা যায় না। প্রাশিয়ান সরকার ও জার্মান সামন্ততন্ত্র তাদের আয়ুষ্কালের শেষ মুখে মরিয়া। তবু জার্মানীর নব্য হেগেলবাদীদের রাজনৈতিক মতামত ততদিনে পরিণত আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এর সামাজিক কারণও ছিল। উদীয়মান বুর্জোয়া গোষ্ঠী তখন প্রাশিয়ান সামন্ততন্ত্রের খবরদারী পছন্দ করছে না। তাদের অসন্তোষ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল 'Rheinische Zeitung' পত্রিকার। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতামতের পোষকতা এই পত্রিকা করেনি। তবু নতুন যুগের উদ্যমশীল লেখকেরা এই পত্রিকার পেছনে এসে জড়ো হলেন। ডয়েশে ইয়ারবুখের-এর লেখকগোষ্ঠী আর একটা মুখপত্র পেয়ে গেলেন। সবাই এসে মিলিত হলেন ফের—মার্কস, বাউয়ের, কোপ্পেন, ম্যাক্স স্টার্নার, হেস, জর্জ

হারভেগ। পত্রিকার জন্মের দশমাস বাদে কর্তৃপক্ষ মার্কসকে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বের আহ্বান জানালেন।

'Rheiniche Zeitung' পত্রিকার সম্পাদকের পদ মার্কস গ্রহণ করলেন।

দায়িত্ব পেয়ে মার্কসের কলম আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। মার্কসের চিন্তা তখন প্রখর রাজনীতির দিকে বাঁক নিয়েছে। এই রাজনীতি প্রতিবাদমুখর ছিল সরকারী অব্যবস্থা, নিপীড়ন আর দমননীতির বিরুদ্ধে। মার্কসের হাতে পড়ে পত্রিকার সরকারবিরোধী রূপ আরো তীব্র হয়ে উঠলো। মার্কস কলম ধরলেন—প্রথম লক্ষ্য সরকারী সেন্সরশিপ। এক এক করে অনেকগুলি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে—সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিন্নভিন্ন। মার্কসের কলমের মুখে সরকারী সেন্সরশিপের বিরোধিতা, ড়ায়েটের রাজনীতি, মোসেলের আঙুরচাষীদের সমস্যা, দরিদ্র অরণ্যবাসীদের কাষ্ঠ সংগ্রহের অধিকারের দাবি তীব্র ভাষায় মুখর হয়ে উঠলো। নিষ্কলুষ মানবতার প্রেরণায় মার্কসের ওই কলম ধরা। তখনো কোনো তত্ত্ব বা বিশেষ কোনো দার্শনিক চিন্তার প্রেরণায় মার্কস উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেননি। নবীন সম্পাদকের কলমের ধার, সহজ যুক্তিবাদ ও আবেগ রাইনিশে ৎসাইটুঙ্ পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুললো। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় আটশো থেকে দু'হাজারে উঠে এল।

এই পত্রিকাতেই মার্কসের প্রথম পরিচয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে। লেখক মোসেস হেস। হেসের রচনা জার্মানীর তরুণ বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনই মার্কস সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তেমন আকৃষ্ট হননি। কিন্তু মার্কসের ক্ষুরধার সমালোচনার মুখে সরকার পক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। যা অবধারিত তাই ঘটলো। ১৮৪২-এর এপ্রিলে মার্কস রাইনিশে ৎসাইটুঙ-এর সম্পাদকীয়ত্ব গ্রহণ করেন, পরের বছর মার্চে পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হোল। মার্কসের চাকরি গেল।

জার্মানীতে কলম ধরা অসম্ভব হয়ে উঠছে। মার্কস প্রচণ্ড রকমে পড়াশুনোর কাজে ডুবে গেলেন। এতদিন মার্কসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক মানবীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল। সাধারণ নীতিবোধের ভিত্তিতে দুঃস্থ সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনায় সরকারী দমননীতির সমালোচনা করে এসেছেন। পড়াশুনো করতে গিয়ে মার্কস সাক্ষাৎ পেলেন সাঁ সিমঁ-র, প্রুধোঁ-র। ফরাসী সমাজ-

তান্ত্রিকদের চিন্তার বিশেষত্ব চোখে পড়লো। এর মধ্যেই এক সমৃদ্ধ জীবনদর্শনের নাতিস্পষ্ট আভাস পেলেন। ফরাসী ভাষা শিখে মার্কস পড়তে শুরু করে দিলেন Fourier, Dezami, Cabet, Saint Simon, Proudhon ও Leroux-এর রচনা।

জার্মানীতে স্বাধীন সাংবাদিকতা যখন অসম্ভব, মার্কস ঠিক করলেন প্যারিসে চলে যাবেন। একা মার্কস নন। রুগেও সেই ইচ্ছে পোষণ করছেন। প্যারিসে গিয়ে মার্কস ও রুগে এক সাময়িক পত্রের জন্ম দেবেন, সেটাই হবে ওঁদের জীবিকা।

তবে প্যারিসে যাওয়ার আগে জেনীকে চাই। জেনীকে ছাড়া মার্কসের ভবিষ্যৎ কই। জেনীর পিতৃদেব ব্যারন ওয়েস্টফালেন দেহ রেখেছেন কিছুকাল আগে। জেনীকে বিয়ে করতে মার্কসকে বেগ পেতে হয়েছিল। ব্যারন ওয়েস্টফালেন মার্কসকে স্নেহ করতেন—তাঁর অবর্তমানে পরিবারের অন্য কর্তাব্যক্তিরা মার্কসকে পছন্দ করবেন কেন? তবু বিয়ে হোল। বিয়ের পর কিছুকাল মধুচন্দ্রিমা যাপন করে মার্কস জেনীকে নিয়ে প্যারিসের পথে পাড়ি দিলেন।

প্যারিসে তখন তরুণ বুদ্ধিজীবীদের হাট বসেছে। বার্লিনে বা বনে যা সম্ভব নয়—প্যারিসে তা সম্ভব। মার্কস ও রুগে পরিকল্পনা মত দুজনেই প্যারিসে গিয়ে হাজির হলেন। হাইনে, বাকুনিন, প্রুধোঁ, কাবের মত তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তখন ফ্রান্সের চিন্তাজগৎ উজ্জ্বল করে রয়েছেন। এঁরা তরুণ ফ্রান্সের র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার পোষক। পত্রিকা প্রকাশে এঁদের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন।

পত্রিকার নামকরণ হোল 'ডয়েশ্চে ফ্রান্‌ৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখের'। লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে অনেককেই পাওয়া গেল। মার্কস, রুগে, হাইনে, বাকুনিন, হারভেগ, ফয়েরবাখ এবং আরো অনেকে। আর একটি নতুন শক্তিশালী কলমের সাক্ষাৎ মিললো। ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, পত্রিকাটি টেকানো গেল না। পত্রিকার দুটো সংখ্যাই মোটে বেরিয়েছিল। প্রথমত, নতুন পত্রিকার আর্থিক সংগতি ছিল না, আর তাছাড়াও সম্পাদক দুজনের মধ্যে মতের অমিল দেখা গেল। মার্কস যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত হতে চলেছেন—রুগে উল্টোপথে

নিলেন, ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের শত্রুপক্ষের দর্শনে আকৃষ্ট হতে শুরু করলেন। তুচ্ছ এক কারণে দুজনের মধ্যে মতান্তর গভীর হয়ে দেখা দিল। রুগেই বরং সম্পর্ক ছিন্ন করতে বেশী আগ্রহী হলেন।

ডয়েশ্চে ফ্রান্‌ৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখের পত্রিকার দুটো সংখ্যায় মার্কসের দুটো বিখ্যাত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। একটি হেগেলীয় দর্শনের আলোচনা—দ্বিতীয়টি তৎকালীন ইহুদী জীবনের সমস্যা সম্পর্কে। আপাতদৃষ্টিতে রচনা দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে বোধ হবে না। কিন্তু বিষয়বস্তু আলাদা হলেও রচনা দুটোর বক্তব্যে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড মিল রয়েছে। মার্কসের মানসিক পরিণতির একটা সুস্পষ্ট স্তর রচনা দুটোর মধ্যে লক্ষণীয়। এই দুটো রচনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে সমাজ সম্পর্কিত কোন ধ্যানধারণায় মার্কসের মনের গতি পরিণতি লাভ করতে চলেছে। প্রথম প্রবন্ধ থেকে মার্কসের ধারণামত নির্বিত্ত মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের কথা মোটামুটি জানা যাবে। দ্বিতীয় রচনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের অস্পষ্ট কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায়। এই দুটো রচনাই আমাদের চোখে তুলে ধরে ভবিষ্যতের কার্ল মার্কসের পরিণত চিন্তার আভাস।

প্রথম রচনায় মার্কস দেখিয়েছেন ধর্মের সমালোচনা নিছক ধর্মের ব্যাপার নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সমালোচনার মধ্য দিয়ে ধর্মের যথার্থ সমালোচনা সম্ভব। ফয়েরবাখের প্রভাব এখানে লক্ষ্য করার মত। এই রচনাতেই প্রথম দেখা গেল মার্কসের আলোচনা আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে চাইছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার (Economic interpretation of history) এই প্রথম প্রয়োগ মার্কস নিজের রচনাতে দেখাতে চাইলেন। মার্কস বললেন শ্রমশিল্প ও পার্থিব সম্পত্তির সঙ্গে রাজনীতির যোগ রয়েছে। আর, তার থেকেই আধুনিককালের প্রধান প্রধান সমস্যার জন্ম হচ্ছে।

দ্বিতীয় রচনাটি মূলত বাউয়ের-এর এক নিবন্ধের সমালোচনা। ইহুদীদের সামাজিক মুক্তির উপায় হিসেবে বাউয়ের বলেছিলেন, জাতীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে ইহুদীদের পরিত্রাণ নেই। মার্কস কিন্তু ধর্মীয় সমাধানের পথে গেলেন না, মার্কস বললেন সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক। ধর্মের প্রভাবের চেয়েও ইহুদী সমাজের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজের

বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম। ইহুদীদের সামাজিক মুক্তি এই সব ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করছে—নতুন ধরনের সামাজিক শক্তির জন্ম দিয়ে নতুন সমাজ সংগঠনার সাফল্যে ইহুদী সমাজের মুক্তি। এই মুক্তির চেষ্টা মানুষের হাতেই রয়েছে। মোটামুটি একটি নাতিস্পষ্ট বিশ্লেষণে এই প্রথম কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা বলেছেন।

প্রথম নিবন্ধে মার্কস শ্রেণীযুদ্ধের তাত্ত্বিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। রাষ্ট্র, সামাজিক সম্পদ্ ও শ্রমশিল্পের মধ্যেকার সম্পর্ক বিচারে সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ও সামাজিক ভূমিকা নির্ণয় করতে পেরেছেন। খুব বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না এসেও মার্কস যা বলেছেন তাতে তাঁর স্বরচিত তত্ত্বের কয়েকটি মৌল উপাদানের সাক্ষাৎ আমরা এখনই পাই—যেমন মার্কস লিখছেন: "The proletariat is the actual dissolution of the old world order. For when the proletariat demands the abolition of private property, it only establishes as the principle of the whole society what is its own social principle."[১]

এখানে স্মরণীয় জার্মানীর Lorenz ও Von Stein-এর একটা নিবন্ধ। Von Stein আসলে রক্ষণশীল হেগেল শিষ্য। Von Stein জার্মানীর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দেওয়ার মানসে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব আলোচনা করে নির্বিত্ত শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকার প্রশ্ন তুলেছিলেন। সর্বহারা শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা তাঁর একটি বাক্যে সুন্দর ফুটে উঠেছে যা মার্কস উল্লেখ করেছেন এই বলে: "I am nothing but I shall be everything."[২] নির্বিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীচরিত্রের রূপ ও নির্বিত্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দখলের সম্ভাবনা মার্কস Von Stein-এর রচনা থেকেই পেয়েছেন। Von Stein-এর বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়েই মার্কস Von Stein-এর আশঙ্কাকে ঐতিহাসিক পরিণতি রূপে চিহ্নিত করেছেন।

ফ্রান্স তখন য়ুরোপের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের স্বর্গ। কয়েক বছর আগে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। ১৭৮৯-র বিপ্লবে ফরাসী সামন্ততন্ত্রের

১. Marx—Introduction to the Critique of Hegel's Philosophy of Law.

২. তদেব

পরাজয় ঘটলেও রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নানা ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব নষ্ট হয়নি। কিন্তু জুলাই বিপ্লবের আঘাতের পর সামন্ততন্ত্রের সামর্থ্য ফুরিয়ে আসতে থাকে। বিশেষ করে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার হাতিয়ারে বলীয়ান্ হয়ে নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটতে শুরু করে এই সময়ে। উদীয়মান বুর্জোয়া সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ় হতে থাকে। ফলে, ফ্রান্সের ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটলো তার প্রভাব প্রচণ্ডভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হতে থাকলো। য়ুরোপের কোথাও এর তুলনা নেই। আর জার্মানী তো হেগেলের দর্শনের গোলক-ধাঁধায় পথ হারিয়েই ছিল। জার্মানী থেকে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা ফ্রান্সেই পালিয়ে আসতে শুরু করেছিলেন।

নতুন সংস্কৃতির পাদপীঠ ফ্রান্স। ফ্রান্সে থাকার সুযোগ মার্কস হেলায় হারালেন না। হেলভেশিয়াস ও হলবাখের বস্তুবাদ, সাঁ সিমঁ-র অর্থনীতি, জোসেফ প্রুধোঁ-র নৈরাজ্যবাদ, ফুরিয়ের ও বাবুফ-এর য়ুটোপিয়ান চিন্তাধারা, গিজো ও থিয়েরি-র ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মার্কসের দিনরাতের অধ্যয়ন হয়ে উঠলো। গভীরভাবে পড়াশুনোয় ডুবে গেলেন মার্কস। মার্কসের এক নতুন জগতে প্রবেশ লাভ ঘটছে। জার্মানীতে ছিলেন কেবল হেগেলীয় দর্শনের পরিবেশে। এখানে সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। জ্ঞানের পারাপারহীন অসীম সমুদ্রে মার্কস সাঁতার কেটে চললেন। এমনও সময় গেছে পর পর তিন চার রাতের ঘুমকেও কাছে ঘেঁসতে দেননি। কতদিন কতবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে মার্কসের সেই জেদ, মনের দৃঢ় সংকল্প : নতুন যুগের চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করতেই হবে।

মার্কস ডুবে রইলেন সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সংক্রান্ত পড়াশুনোয়। প্যারিস শহরে সুযোগের অভাব ছিল না। প্যারিসের আকাশ বাতাস সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ভরপূর। সমাজতন্ত্রের নব নব তত্ত্ব ব্যাখ্যায় চিন্তাশীল লেখকের অভাব ছিল না। মত অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আলাপ-আলোচনায় ও নিবন্ধ মারফৎ তর্কে বিতর্কে ফ্রান্সের চিন্তার জগৎ ভরে রেখেছিলেন অনেকেই। ছিলেন সাঁ সিমঁ-র শিষ্যেরা; ফুরিয়ের-এর গোষ্ঠী; লেরু (Leroux), ক্যাথলিক পুরোহিত লামেন্নাই (Lamennais), সিসমঁদি (Sismondi), বুরে (Buret), পেকার (Pecquer) ও ভিদল

(Vidal)। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রও বাদ ছিল না। বেরাঞ্জার (Beranger)-এর সংগীত আর জর্জ স্যাণ্ড-এর চমকপ্রদ উপন্যাস থেকেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারিত হোত।

সমাজতন্ত্রের এই সব ধারণার মধ্যে কোনোরকম সংগ্রামের কথা খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রায় প্রত্যেক তত্ত্বেই বিত্তবান্ শ্রেণীর মর্জির পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল। আশা ছিল সমাজ-সংস্কারের চাপে বিত্তবান্ মানুষেরা একদিন না একদিন নিজেদের সম্পদ্ বণ্টনে উদ্যোগী হয়ে উঠবেন।

সম্পদ্ বণ্টনের এই সরল যুক্তির ফাঁকিতে মার্কসের মন সাড়া দেয়নি। সমাজতন্ত্রের প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে মার্কস সাঁ সিমঁ আর বাবুফ-এর অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। মার্কসের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের কয়েকটি মৌল উপাদান সাঁ সিমঁ আর বাবুফ-এর চিন্তার মধ্যে ছিল। মার্কস তা স্বীকার করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রায় সমকালীন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাগুলোর সঙ্গে সাঁ সিমঁ একমত ছিলেন না। ফরাসী বিপ্লবকে সামন্ত আর অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে নিছক বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম বলে তিনি মনে করেননি।

সাঁ সিমঁ-র মতে ফরাসী বিপ্লব অবশ্যই শ্রেণী-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বিত্তবানের সঙ্গে নির্বিত্ত শ্রেণীর। ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রাম কেবল ফরাসী বিপ্লবেই ঘটেনি। মানুষের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে শ্রেণী-সংগ্রামের নানা কাহিনী পাওয়া যাবে। শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত নিয়েই মানুষের ইতিহাস। সাঁ সিমঁ আরো বলেছেন যে, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত। মূলত সমাজের আর্থিক বনিয়াদ-ই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের তত্ত্ব সাঁ সিমঁ বিস্তারিত করেননি কিন্তু আভাস দিতে পেরেছেন। সাঁ সিমঁ-র ভাবনা থেকে মোটামুটি দুটো মৌল উপাদান মার্কস গ্রহণ করেছেন—ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যায় (materialist interpretation of history) মার্কসীয় চিন্তার দুটো উপাদান। প্রথমটি, মানব-ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস; দ্বিতীয়টি, পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের গভীরতা।

বাবুফ-এর বিখ্যাত পুস্তক 'Tribun du Peuple'। বাবুফ এক ধরনের

সাম্যবাদ প্রচার করেছেন—শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য সেখানে। শুধু পুঁথিগত আলোচনা নয়—বাবুফ সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে লড়াইয়ের ময়দানেও নেমেছিলেন। প্যারিসের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন তৈরী করেছিলেন—সেনাদলে ও পুলিশের মধ্যেও তাঁর গুপ্ত দল ছিল। বাবুফ প্রচার করতেন, বিত্তবানেরা কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতার দখল ছাড়বে না—খেটে-খাওয়া মানুষদের তা ছিনিয়ে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত এক অসফল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বাবুফ-এর প্রাণদণ্ড হয়। বাবুফ-এর উত্তরাধিকারের দায় বহন করেন ব্ল্যাঙ্কি (Blanqui)। ব্ল্যাঙ্কিও দল তৈরী করেছিলেন এবং অসফল 'ক্যু'-র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাবুফ-এর তত্ত্ব ব্ল্যাঙ্কির হাতে পড়ে ঘসা-মাজা হয়ে কিছুটা বাস্তবমুখী রূপলাভ করে। নিছক কাল্পনিক সাম্যবাদের ধারণা থেকে ব্ল্যাঙ্কি সরে আসতে পেরেছিলেন। মার্কস (পরে লেনিনও) ব্ল্যাঙ্কি সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক মার্কসবাদী তত্ত্বের উদ্ভাবনা ব্ল্যাঙ্কি সহজতর করে তুলেছিলেন।

১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবই সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চিন্তার উৎসমুখ খুলে দেয়। যদিও ফরাসী বিপ্লবের বহু আগে থেকে কল্পনাশ্রয়ী সমাজতান্ত্রিক ভাবনার জন্মলাভ হয় তবে এর পুষ্টিলাভের মূল উপকরণ ছিল বস্তুবাদী দর্শন। প্রধানত যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভব। এর পরিণতি ছড়িয়ে পড়লো দুটো ধারায়। প্রথম পরিণতি মূলত যুক্তিবাদে—যেখানে বলা হোল যুক্তির সোপান বেয়ে সত্যকার জ্ঞানে পৌঁছানো যায়। এই যুক্তিবাদের প্রতিভূ দেকার্তে (Descartes)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ দেকার্তে-অনুসৃত পথেই মসৃণতর হয়েছে।

বস্তুবাদের দ্বিতীয় পরিণতি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায়। যুক্তির সোপান বেয়ে সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণের সমস্যা-বিচারে দর্শনকে নামিয়ে আনলেন হলবাখ আর হেলভেশিয়াস। হলবাখ বলেছেন—সামাজিক অসাম্যের জন্ম বঞ্চনা থেকে। অন্যায়ের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে শাসক সম্প্রদায় শ্রেণীগতভাবে বিকৃতমনা। নীতিহীন শাসকের শাসনে সাধারণ মানুষও কখনো যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হয়নি। সম্পত্তির অধিকার প্রতিটি মানুষের। যদিও সম্পত্তির সমবণ্টনের কথা হলবাখ বলেননি, তবু সামাজিক সুযোগ পাওয়ার অধিকার সকলের রয়েছে—এ কথা হলবাখ স্বীকার করেন। হেলভেশিয়াস

বলেছেন, সামাজিক স্বার্থকে বলি দিয়ে নিজের স্বার্থকে সবার উপরে দেখার অর্থ হোল নৈতিক অবনতি। এই পার্থক্য বিনাশ করাই সমাজের সঠিক কর্তব্য। মার্কস বলেছেন, হেলভেশিয়াস ও হলবাখের দর্শন হোল 'দ্য সোসাল বেসিস্ অব কমিউনিজম'—সাম্যবাদের সামাজিক ভিত্তি।

মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি

বস্তুবাদী দর্শন, বাবুফ ও ব্ল্যাঙ্কির বিপ্লবচিন্তা, সাঁ সিমঁ-র অর্থনীতি ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা, মার্কসীয় দর্শনের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির সন্ধান দিয়েছে যা একান্তভাবেই মার্কসীয়। মার্কসীয় প্রজ্ঞায় তাত্ত্বিক উপলব্ধির বাস্তবায়িত হবার একমাত্র পথ হোল খেটে-খাওয়া মানুষদের আন্দোলন। এখানেও মার্কস তাঁর পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী।

১৮৩৯-এর ব্যর্থ বিপ্লবের পর শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ক্রমশ নিকটবর্তী হতে শুরু করে। মার্কসের দৃষ্টি তা এড়ায়নি। প্রথমত সে সময়ে ফ্রান্সে ছিল ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি। ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত এই পার্টি কিন্তু তাদের আন্দোলন রাজনীতির পথেই পরিচালিত করে। এঁদের নেতারা বিত্তবান্ শ্রেণীর পরিবর্তিত মর্জিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দখলের সুবাদেই শোষিত শ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সফল হবে—সচেতনভাবে এই চেষ্টায় ফ্রান্সের ওই পার্টি সক্রিয় ছিল। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো স্থায়ী সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়—এমন ঘোষণায় এঁদের তৎপরতা মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন।

ইতোমধ্যে বিত্তহীন শ্রেণীর ভিতর থেকেও এমন মানুষের আবির্ভাব শুরু হোল যাঁরা নিজেদের সামাজিক মুক্তির চেষ্টায় তত্ত্ব ও নেতৃত্ব দুই-ই জুগিয়েছেন। লেরু, প্রুধোঁ দুই চিন্তাবিদ্ই শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তত্ত্বগত চিন্তায় সমমতাবলম্বী না হলেও দুজনের প্রতিই মার্কস শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। প্রুধোঁ-র প্রথম রচনা[১]কে মার্কস সমকালীন সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামের প্রথম ইশ্তেহার (First Manifesto) বলে গণ্য করতেন।

এঁদের তাত্ত্বিক উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা মার্কস মেনে নেননি। মার্কস ক্রমশ এক সামগ্রিক প্রকল্পের প্রান্তদেশে এসে পৌছুলেন—যার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রবাদ, সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা ও পরিশেষে শ্রেণীহীন সাম্যবাদের

১ Qu'est-ce que la propriete—Pierre Joseph Proudhon, 1840

ধারণা এক সমন্বয়ের মধ্যে থাকছে। সামাজিক মানুষের মুক্তির চেষ্টায়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মার্কস ওই সামাজিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ওই প্রয়োজনের দিকে মার্কস আগ্রহদৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন হেগেলের 'ফিলসফি অব ল'-[১]এর আলোচনা প্রসঙ্গে। মার্কসের মতে এই প্রকল্প নিছক তাত্ত্বিক উপলব্ধি হবে না—তা মানুষকে প্রগতির হাতিয়ার জোগাবে, সামাজিক কাঠামো বদলে প্ররোচিত করবে।[২]

মার্কসের এই তাত্ত্বিক উপলব্ধির মৌলিকত্ব হোল এর সামগ্রিকতা। মৌলিকত্ব, শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজের ভবিষ্যৎ রূপকর্মকে এক প্রতীতির (Perception) মধ্যে সমন্বিত করার চেষ্টায়। এবং এই প্রতীতি এক নিবিড় দর্শনচিন্তার হাতিয়ারে সমৃদ্ধ—হেগেল থেকে যার শুরু এবং পরিণতি ফয়েরবাখে।

বিদ্রোহী হেগেলীয়দের তিনটি শাখার একটির প্রেরণা ফয়েরবাখ। স্ট্রউস, বাউয়ের হেগেলীয় ভাববাদ থেকে সরে এসে যেখানে থেমে গিয়েছিলেন, ফয়েরবাখের আরম্ভ সেখান থেকে। হেগেলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরের নিত্যতায় বা নির্ব্যূঢ় সত্তায় (Absolute Reality) প্রথম আঘাত দিয়েছিলেন স্ট্রউস। স্ট্রউসকে অতিক্রম করে গেলেন বাউয়ের। বাউয়ের হেগেলের পরমভাবের (Absolute Idea) কোনো স্বীকৃতি দিলেন না এবং বাইবেল ও ঈশ্বরকে নেহাৎ লৌকিক পর্যায়ে টেনে নামালেন। যিশুকে বললেন ঐতিহাসিক পুরুষ। আরো এগিয়ে এসে ফয়েরবাখ বললেন ধর্মের জগৎ আসলে কোনো জগতই নয়, নিছক কল্পনা—মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাবগত পরিপূরক। (a projection of human needs or compensatory fulfilment)

ফয়েরবাখকে বলা হয় হেগেলের নিয়তি। হেগেল বলেছেন, বিশুদ্ধ ভাবের বিকাশ থেকে বিশ্বের জন্ম। বিশ্ব হোল পরমভাবের প্রকাশ। কিন্তু ফয়েরবাখ বললেন প্রাথমিক সত্য হোল মানুষ ও মানুষের জগৎ। জাগতিক বিকৃতি ও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে ধর্মের উৎপত্তি। ধর্মের ধারণা ও তত্ত্ব মানুষের তৈরী। মানুষ তার আদর্শ সত্তাকে ধর্মের প্রতিচ্ছায়ায় স্থাপন করে দেখে। ধর্ম কোনো

১ Theory becomes a material force as soon as it lays hold of the masses.

২ Marx—Introduction to the Critique of Hegel's Philosophy of Law.

প্রকৃত সত্তাকে উন্মুক্ত করে না। পরমভাবের (Idea) প্রবাহ থেকে মানুষের জন্ম নয়, পক্ষান্তরে মানুষের মনের ভাব থেকেই ঈশ্বর ও ধর্মের উদ্ভব, পরমভাবের কল্পনা। আসলে, হেগেলের পরমভাবের নিত্যতায় বিশ্বাস রাখলে ইতিহাসের গতিশীলতায় আস্থা হারাতে হয়—কেননা শেষ পর্যন্ত সভ্যতার অগ্রগতির পথ এক চরম সীমায় এসে থেমে যাবে। হেগেলকে অনুসরণ করলে, মানুষের ভাগ্য পরমভাবের ইচ্ছার কাছে বাঁধা রাখতে হয়। মানুষের ভাগ্য জয় করার চেষ্টায় তখন ইতি পড়বে। চরম নিয়তিবাদে শেষ হবে সমাজ ও সভ্যতার প্রগতি।

ফয়েরবাখ ও মার্কস

তরুণ হেগেলীয়দের মধ্যে ফয়েরবাখ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৮৪৩ সালে। নতুন যুগের চিন্তাবিদ্‌দের এক সংকলন গ্রন্থে[১] ফয়েরবাখ স্থান পেয়েছিলেন। ফয়েরবাখের নিবন্ধ ছিল "দর্শনের সংশোধন বিষয়ক প্রাথমিক গবেষণা"। মার্কসের উপর এই নিবন্ধের প্রভাব অকল্পনীয়। অন্তত মার্কসের মানসিক পরিণতির এক দিকের ভিত্তি ফয়েরবাখ নির্মাণ করেছেন। মার্কসের কাছে সেই ফয়েরবাখ গ্রহণীয় যিনি হেগেলের দ্বিধাদ্বন্দ্ব চুরমার করে বস্তুবাদকে উচ্চাসনে বসিয়েছেন। হেগেলের সংঘাতের পদ্ধতি ব্যবহার করেই ফয়েরবাখ খৃস্ট ধর্মের অবাস্তবতা দেখিয়েছেন। ফয়েরবাখ দেখালেন, হেগেলের দর্শনকে সঠিক ব্যাখ্যা করলে হেগেলের নিজস্ব যা প্রতিপাদ্য—পরমভাব (Absolute Idea)—তা আর ধোপে টেঁকে না অথচ হেগেল নিজস্ব যুক্তির ফাঁক দিয়েই পরমভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতিনিয়ত সংঘাতের মাধ্যমে বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার প্রত্যয় মেনে নিয়েও পরমভাবের অস্তিত্ব বিচারে হেগেল বললেন এর অস্তিত্ব সনাতন। হেগেলের চিন্তার পরস্পরবিরোধী প্রত্যয়গুলি ফয়েরবাখ উন্মুক্ত করে দিলেন হেগেলীয় বিচারপদ্ধতির রীতি মেনেই। তবু মার্কস দেখলেন ফয়েরবাখ এক জায়গায় এসে থেমে গেছেন। যেটা তাঁর প্রধান ত্রুটি তা হোল ফয়েরবাখ বস্তুকে কেবল বস্তু হিসেবেই বিচার করেছেন—মানুষকে মানুষ হিসেবে। কিন্তু অমূর্ত মানুষকে মূর্ত রূপ দিয়েই বিচার করতে হয়। বস্তুকে নিছক বস্তু হিসেবে বিচার করলে চলবে না। বস্তু, মানুষ বা

১ Anekdota zur neusten deutschen Philosophie und Publigistie.

কোনো ঘটনার বিচারে পরিবেশ-প্রভাবের স্বীকৃতিও দিতে হয়—বস্তু কখনই বিষয় বা ভাব নিরপেক্ষ নয়। তবু তরুণ বামপন্থী হেগেলীয় ভাবরাজ্যে নতুন চিন্তার যে খোরাক ফয়েরবাখ এনে দিলেন মার্কস তাকে স্বাগত জানালেন।

ফয়েরবাখের সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির অমিলটুকু বুঝতে পারলে মার্কসের মৌল প্রত্যয়গুলো ধরতে কষ্ট হয় না। মানুষকে সম্পূর্ণ বিমূর্ত বা ভাবমূলক পরিবেশে না দেখলেও ফয়েরবাখ মানুষকে জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। দেখেছেন মনুষ্যসত্তার আদর্শ হিসেবে (manifestation of the essence of humanity)—জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বের ধারণা হিসেবে। কিন্তু মার্কস দেখতে চাইলেন বাস্তব মানুষকে, মনুষ্যত্বের ধারণাকে নয়—যে মানুষের সত্তা পরিবেশ-প্রভাবের চাপে বিমূর্ত থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, বিশেষ করে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের পরিবেশে অবস্থিত মানুষকে—আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিণতিস্বরূপ মানুষকে। ফয়েরবাখের মানুষ বিচ্ছিন্ন সমাজসম্পর্কচ্যুত ব্যক্তি-মানুষ। কিন্তু মার্কস দেখলেন পরিবেশ-প্রভাবে মানুষের মনুষ্যসত্তার সারটুকু টিকে থাকে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা সম্ভব নয়, অন্তত শ্রেণীবিভেদের বিলুপ্তি না ঘটলে মনুষ্যসত্তার আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিলোপকরণের প্রশ্নে আরো নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। বিশেষ করে মানুষ যখন সামাজিক জীব। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও সম্পর্কের মধ্যে মানুষের প্রকৃত সত্তা লক্ষণীয়। মানুষ সম্পর্কে এই হিসেবটুকু থাকলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষ দেখার প্রবণতা থাকে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানবদর্শনের বিচারে মার্কসকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছে, এই উত্তর খোঁজার তাগিদে মার্কসের কাছে সমাজ-কাঠামোর ছবি পরিষ্কার ধরা পড়ে। দর্শন বিচারের সঙ্গে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের এই নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়াই মার্কসের মৌলিকত্ব। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফল স্বরূপ ফয়েরবাখ মার্কসের প্রতীতি কখনোই উপলব্ধি করতে পারেননি—যা ফয়েরবাখের পক্ষেই হয়তো করা সম্ভব ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে মনুষ্যসত্তাকে খোঁজার প্রবণতা ছিল না বলেই মার্কস সামাজিক সম্পর্কের রূঢ়তা থেকে, অন্যায় থেকে মানবের মুক্তির প্রশ্ন তুলতে পেরেছিলেন। দর্শনের ভাবমূলক পথ থেকে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের পথে,

কার্যক্রমের সঠিক রাস্তায় (programme of action) দর্শনকে নামিয়ে এনেছিলেন। মার্কস বললেন, মানুষকে বিচার করতে গিয়ে দর্শন নির্লিপ্ত চিন্তাসমষ্টি রূপে প্রকাশ পায় না, দর্শন হয় তখন 'প্রোগ্রাম অব অ্যাকসন'।

প্রসঙ্গত, দর্শনের আলোচনা থেকে মার্কস যুক্তিসংগতভাবে চলে এলেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিবিধ প্রশ্নে। মার্কস তাঁর প্রথম অর্থনৈতিক বক্তব্য রাখলেন "১৮৪৭-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি"তে। এই অর্থনৈতিক আলোচনাতেও মার্কস ফয়েরবাখের প্রভাব এড়াতে পারেননি। ফয়েরবাখের কতকগুলি দার্শনিক প্রত্যয়ও মার্কস অর্থনীতির আলোচনাতে ব্যবহার করেছেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিযুক্তি (alienation) প্রত্যয়টি।[১] অবশ্য হেগেলীয় দর্শনেই প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। মার্কস কিন্তু প্রত্যয়টিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আলোচনায় সার্থকভাবেই প্রয়োগ করেছেন।

প্রত্যয়টির সামান্য আলোচনা এখানে প্রয়োজন—বিশেষ করে মার্কসের এই সময়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এই প্রত্যয়টিতেই কেন্দ্রায়িত হয়েছে। ফয়েরবাখ তাঁর "খৃষ্টধর্মের সারমর্ম" নিবন্ধে বিযুক্তি প্রত্যয়টি ধর্মের সমালোচনায় প্রয়োগ করেছিলেন। ফয়েরবাখ বললেন, মানুষ যখন ঈশ্বরের চিন্তা করে তখন আসলে নিজের সদ্বৃত্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ঈশ্বরে আরোপ করে—ঈশ্বরের কল্পনা করতে গিয়ে মানুষ নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। মানুষ থেকে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের কল্পনা। ওটা নিছক কল্পনাই এবং আসলে মানুষকে ধর্মীয় বিযুক্তি লঙ্ঘন করে ঈশ্বরে আরোপিত সত্তাগুলিকে নিজ সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে।

ফয়েরবাখের এই ধারণা মোটামুটি অমূর্ত মানুষকে ঘিরে—যে মানুষের চারপাশে তার পরিবার পরিজন নেই—আর্থিক ও জাগতিক বন্ধন নেই। ঈশ্বরেরও ঊর্ধ্বে এই বিচ্ছিন্ন মানবতাবোধের স্থান দিয়ে ফয়েরবাখ ধর্মের সমালোচনা করতে পেরেছেন বটে, তা কিন্তু যান্ত্রিক সমালোচনাতেই পরিণত হয়েছে। ফয়েরবাখের এই বিমূর্ত মানবতাবোধ মার্কসকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। রুগেকে লেখা একটি চিঠিতে কয়েকটা লাইনে মার্কসের বক্তব্য

১ প্রাকৃতিকতা (Naturalism), মানবতাবোধ (Humanness), বিযুক্তি (Alienation)—এই সব প্রত্যয়গুলিকে যথাসাধ্য পরিবর্তিত অর্থে মার্কস ব্যবহার করেছেন।

আরো পরিষ্কার হয়েছে: "আমার মতে তিনি (ফয়েরবাখ) রাজনীতির তুলনায় প্রকৃতির উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি মনে করি যে, একমাত্র রাজনীতির উপর নির্ভর করেই দর্শন আত্মোপলব্ধি করতে পারে।"

মার্কস এখানে বাস্তব অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকের উপর জোর দিচ্ছেন, কেননা মানুষকে তিনি জাগতিক পরিবেশ থেকে বিযুক্ত করে দেখছেন না। ফয়েরবাখের সঙ্গে মার্কসের এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিযুক্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গও আসছে—কেননা এখানে মার্কসের আলোচ্য মানুষ সমাজ, রাজনীতি তথা অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত নয়। মার্কসের আলোচ্য মানুষ অমূর্ত মানুষ নয়। তবে এখানে বিযুক্তির সমস্যা উঠছে কিসে? মার্কস এখানে বিযুক্তি সমস্যাকে শ্রেণী সমস্যা রূপে দেখিয়েছেন। মার্কস বললেন, শ্রমিক আপন শ্রমের পূর্ণ মূল্য পায় না, অর্থাৎ নিজের শ্রম থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে—এই বিযুক্ত শ্রমের দখল পায় পুঁজিপতি। শ্রমিকের বিযুক্ত শ্রম পুঁজিপতির সম্পদ্ স্ফীততর করে তোলে। শুধু তাই নয়, উৎপাদন ব্যবস্থার উপর শ্রমিকের দখল না থাকায় শ্রমিকও উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত থাকে—এই বিযুক্তি সমস্যা সম্পূর্ণতই শ্রেণী সমস্যা। বিযুক্ত শ্রমের প্রশ্ন থেকেই মার্কস বুর্জোয়া সমাজের অর্থশাস্ত্র ও ধনতন্ত্র ব্যবস্থার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

অর্থনীতির আলোচনায় এইবারে মার্কস একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত করলেন—সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এতদিনের পুঁথিগত শিক্ষায় মার্কস যা জেনেছিলেন তা ছিল ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম। সমকালীন আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা রচিত হয়নি মার্কসের মন তাতে সায় দেয়নি। সমকালীন আর্থিক পরিমণ্ডল বলতে তৎকালীন পণ্য উৎপাদন প্রণালী, শ্রমের মূল্য, মুনাফা, সঞ্চিত পুঁজির ভূমিকা, ব্যক্তিগত মালিকানা—এই সবের সঙ্গে সমাজের যোগ বোঝায়। সমাজ অর্থে সামাজিক মানুষের উপর এদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ। এখানে জেনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রচলিত আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রথম বিশ্লেষণ করেছিলেন এঙ্গেলস—মার্কসের আজীবন সুহৃৎ ও সচিব। (অবশ্য এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের সম্বন্ধ এই দুটো কথায় সম্পূর্ণ বলা যায় না—এক আশ্চর্য আত্মিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে দুটি মানুষ জীবন কাটিয়েছেন যার তুলনা নেই)। অথচ

এই সময়ে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলস-এর পরিচয় খুবই সামান্য ছিল। এঙ্গেলস-এর রচনা *Outline of A Critique of Political Economy* ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাধারণ সমালোচনার এক কাঠামো মাত্র, তবু এই রচনা মার্কসের কাছে পথনির্দেশকারী ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানায় ও পুঁজির শাসনে সমাজের সঠিক চেহারা এঙ্গেলসই প্রথম তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের সহযোগিতায় যে সম্পদ্ বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে ক্রমশ পুঁজির সঙ্গে শ্রমের বিরোধিতাই বেড়ে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে উদ্ভব হচ্ছে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ। সম্পদ্ বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণীবিভেদ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠছে—এই সূত্রে এঙ্গেলস বিভিন্ন আর্থিক নীতি, যথা, বাণিজবাদ (Mercantilism), স্মিথের অবাধ বাণিজ্য নীতি (Free trade doctrine), ম্যালথুসীয় তত্ত্ব এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে যে সব হেত্বাভাস (fallacy) রয়েছে—সব কিছুই উন্মুক্ত করে দেখাতে পেরেছেন। এই বিশ্লেষণ মার্কসের চিন্তাকে আরো স্বচ্ছ করেছে। এঙ্গেলসই মার্কসকে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও রিকার্ডোর অর্থনীতির দিকে আকৃষ্ট করেছেন। এই সূত্রে স্মরণীয় যে, রিকার্ডোই প্রথম বলেছিলেন যে পণ্যের মূল্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়—শ্রমিকের শ্রমের মূল্য ও মুনাফা। এই তত্ত্বকেই মার্কস আরো বিস্তৃত করেছিলেন। "১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি"তে[১] মার্কস যথার্থই ইঙ্গিত দিতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত পণ্য উৎপাদন প্রণালীর পরিবেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজির দুষ্ট প্রভাবে একদিন বিপ্লব জন্ম নেবে। এই বিপ্লবই ধনতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে।

১৮৪৫-এর জানুয়ারিতে মার্কস প্যারিস থেকে বিদায় নিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কস প্রকাশ করলেন 'পবিত্র পরিবার' (The Holy Family)—মার্কস ও এঙ্গেলস-এর যৌথ রচনা। প্যারিসে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশের মধ্যে লেখা—রচনাটি মূলত বাউয়ের-এর ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা।

প্রথম যুগে মার্কসের সঙ্গে বাউয়ের-এর যোগাযোগ ছিল একান্ত অন্তরঙ্গ। ক্রমশ দেখা গেল দর্শন বিচারে বাউয়ের হেগেলীয় ভাববাদের গণ্ডী অতিক্রম

১ *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.*

করতে পারেননি। বাউয়ের একদা বামপন্থী হেগেল শিষ্যদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হেগেলীয় বামপন্থার সঙ্গে বাউয়ের-এর যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত টিকে রইল না। যদিও বাউয়ের পরমভাবের সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাস না রেখে পরিবর্তন বা বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন—কিন্তু বাউয়ের কথিত বিপ্লব জনগণের নেতৃত্বে সম্পন্ন হবে না। বাউয়ের-এর মতে শুদ্ধবুদ্ধি বা চেতনার জাগরণ সমাজে এই বিপ্লব আনবে, এর জন্য কোনো কার্যক্রমের, প্রচারের বা সচেতন চেষ্টার প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ চেতনার প্রভাব যেদিন মানুষের উপলব্ধিতে আসবে সেইদিনই মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয়ে সত্যিকারের বিপ্লবের জন্ম হবে—ইতিহাসের এক সাধারণ নিয়মেই ঘটবে বিপ্লবের আবির্ভাব। বাউয়ের তৎকালীন সমস্ত আন্দোলন বা সংস্কার চেষ্টার বিরোধিতা শুরু করলেন। স্ট্রউস ও ফয়েরবাখের সমালোচনা করে বাউয়ের নিবন্ধ রচনা করেছিলেন—Die Posaune des jungsten Gerichts uber Hegel den Atheisten und Antichristen[১]।

এ রচনায় হেগেলেরও সমালোচনা ছিল। হেগেলের বিরোধিতা করে বাউয়ের ফয়েরবাখকেও আক্রমণ করলেন। "ইহুদী সমস্যা" প্রবন্ধে মার্কস বাউয়ের-এর প্রথম সমালোচনা করেছিলেন। বাউয়ের বলেন ইহুদী ধর্মের জোয়াল থেকে মুক্ত না হলে কোনো সমস্যা থেকে ইহুদীদের মুক্তি নেই। মার্কস বললেন মূল সমস্যা ধর্মকে ঘিরে নয়—সমস্যার জন্ম প্রচলিত আর্থিক পরিবেশের মধ্যে, সামাজিক শ্রেণীবিভেদের মধ্যে। সম্ভবত এখান থেকেই শুরু হল বাউয়ের-এর সঙ্গে মার্কস-এর বিভেদ।

বাউয়ের-এর সহযোগী ছিলেন তাঁর ভাইয়েরা। এডগার বাউয়ের ও এগবার্ট বাউয়ের। এর পর কয়েকটি নিবন্ধে বাউয়ের মার্কসকে কঠিন সমালোচনা করেন। মার্কস জবাব দিলেন 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থে। ভ্রাতাসহ বাউয়ের পরিবারকে মার্কস ও এঙ্গেলস আখ্যা দিলেন—'পবিত্র পরিবার'। বাউয়েরকে বললেন—"সেণ্ট ব্রুনো"।

হেগেলের দর্শনে ভাবের প্রাধান্য থাকলেও ভাবের সঙ্গে জগৎ অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। বাউয়ের ভাবকে বস্তু বা জগৎ থেকে আলাদা করে দেখালেন। বাউয়ের বললেন, ভাবনা বা চিন্তার প্রবাহ ইতিহাসের রূপান্তর ঘটায়—এ

১ Trumpet of the last judgment on Hegel the Atheist and Antichrist.

ক্ষেত্রে মানুষের সচেতন কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে শ্রেণীবিভেদের তত্ত্ব কেবল গোলমাল (confusion)-ই বাড়াবে। মার্কস দেখালেন বাউয়ের-এর চিন্তায় গোড়াতেই গলদ। বস্তু বা জগৎ থেকে ভাবকে আলাদা করা যায় না—ভাবকে আলাদা করে দেখার অর্থই হোল ভাববাদে ফিরে যাওয়া, পক্ষান্তরে নতুন ধর্মতত্ত্বের উদ্ভাবনায় সাহায্য করা। এই সূত্রে বাউয়ের গোষ্ঠী পবিত্র পরিবার আখ্যায় ভূষিত হতে পারে।

প্রসঙ্গত, মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিষ্কার ধারণা এ রচনায় আনতে পেরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ফরাসী বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে মার্কস দেখালেন, উদীয়মান 'বুর্জোয়াজি'র শ্রেণীস্বার্থের সহযোগী ছিল বলেই ফরাসী বিপ্লবের ভাব বিপ্লবের জোয়ার আনতে পেরেছে। এ ক্ষেত্রে বিপ্লবের চেতনা বৈপ্লবিক কর্মধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

দুটো প্রধান মূল বিষয় 'পবিত্র পরিবার' থেকে পাওয়া যায়। প্রথম, হেগেলীয় ভাববাদের সুনিপুণ ও যথার্থ সমালোচনা। দ্বিতীয়, মার্কস কথিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। বলা চলে, 'পবিত্র পরিবার' রচনা থেকেই মার্কস-এঙ্গেলস-এর পরিণত চিন্তার প্রসাদ লক্ষণীয়।

জার্মান চিন্তাধারা

'পবিত্র পরিবার' প্রকাশিত হোল ১৮৪৫-এর ফেব্রুয়ারি। এর এক মাস আগে জানুয়ারিতে মার্কস প্যারিস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'Vorwarts' পত্রিকায় মার্কস নিয়মিত লেখা দিতে শুরু করেছিলেন। Vorwarts-এ মার্কসের রচনা প্রুশীয় সরকারের রোষবহ্নিতে পড়ে। এখানেও মার্কসের সঙ্গে রুগের রচনার মাধ্যমে বিতর্কের সূচনা হয়। সাইলেশীয় প্রদেশের 'তন্তুবায় বিদ্রোহে'র সমর্থনে মার্কসের মুখর কলম রুগের প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার তীব্র বিরোধিতা করে। রুগের সঙ্গে সখ্যতার এখানেই ইতি ঘটে। কিন্তু ক্রমশ ক্ষতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়। প্রুশীয় সরকার নিরন্তর ফরাসী সরকারকে চাপ দিতে থাকে। প্রাশিয়ার চাপে মার্কস-সহ Vorwarts পত্রিকার আরো কয়েকজন লেখক ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হলেন।

বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেলসে এসে উপস্থিত হলেন মার্কস। বেলজিয়ম সরকার প্রমাদ গণলেন। শেষ পর্যন্ত মার্কসের অবস্থান শর্তাধীন করে দিলেন। শর্ত, ব্রুসেলস থেকে মার্কস কোনো রকমেই বেলজিয়মের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

'পবিত্র পরিবার' শেষ হতেই মার্কস হাত দিয়েছিলেন ফয়েরবাখ সংক্রান্ত সমালোচনায়। মার্কসের মৃত্যুর পর এর পাণ্ডুলিপি এঙ্গেলসের হাতে আসে ১৮৮৫ সালে। সম্ভবত রচনাটি অসম্পূর্ণ। এগারটি প্রসঙ্গে ফয়েরবাখ সম্পর্কীয় আলোচনার খসড়া মাত্র (Theses on Feuerbach)। মূলত ফয়েরবাখের প্রচারিত যান্ত্রিক জড়বাদের বিরোধিতা। মার্কস দেখালেন ফয়েরবাখের ধারণায় মানুষের মন জাগতিক কর্মকাণ্ডের নিষ্ক্রিয় গ্রাহক মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেখানে মানুষের মন তার পরিবেশের সঙ্গেই সক্রিয়। মানুষ তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, চাহিদা এবং সাধ্য অনুযায়ী মনের বাইরের জগৎকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। আসলে ফয়েরবাখ মানুষকে দেখতে চেয়েছেন 'মনুষ্যত্বের মৌল বিমূর্ত সত্তা' হিসেবে। বাস্তব, সক্রিয় ও সামাজিক মানুষ হিসেবে নয়। ফয়েরবাখের মানুষ বিচ্ছিন্ন একাকী সমাজচ্যুত নিষ্ক্রিয় মানবক মাত্র।

ফয়েরবাথ মানুষকে বাস্তব বা সক্রিয় পরিবেশে দেখছেন না। বাস্তব পরিবেশের মানুষ সামাজিক শোষণ ও নানারকম বিযুক্তি ও বিচ্ছেদের (alienation) সঙ্গে জড়িত। এই বিযুক্ত বা বিচ্ছেদময় অবস্থার কোনো ব্যাখ্যা ফয়েরবাখের জানা নেই। ফলত, প্রতিকারও জানা নেই। কেবল ধর্মের বিভ্রম জনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার দরুন মনের বিচ্ছিন্ন ভাবকে ফয়েরবাথ দেখেছেন। কিন্তু শ্রেণীবিভেদ লাঞ্ছিত সমাজে যে মনুষ্যত্ব থেকে মানুষের বিচ্ছেদ—সেই বিচ্ছেদের অবসান হতে পারে একমাত্র সামাজিক শ্রেণী বিভাগের অবলুপ্তি ঘটলে। অতএব মানুষের বর্তমান অবস্থা যেমন তত্ত্বগতভাবে সমালোচনার যোগ্য, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণত পরিবর্তনীয়ও বটে। এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও সম্পর্কের মধ্যে মানব চরিত্র ও প্রকৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকলে সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানবের কল্পনা টেকে না। এই 'থিসিসে' মার্কস প্রসঙ্গটি শেষ করেছেন তাঁর বিখ্যাত উক্তি দিয়ে: "Hitherto philosophers have only sought to interpret the world in various ways : the point, however, is to change it."

ব্রুসেলসে এসে মার্কস অনেক সহযোদ্ধা ও বন্ধু পেয়ে গেলেন। এঁদের সকলেই জার্মানী থেকে রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত হয়ে বেলজিয়মে আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কবি ফ্রাইলিগ্রাথও (Freiligrath) ছিলেন। ফ্রাইলিগ্রাথের সঙ্গে মার্কস আজীবন সম্পর্ক রেখেছিলেন। হাইনের মতই কবি ফ্রাইলিগ্রাথও মার্কসের সাহিত্য ও শিল্প মানসিকতার এক উৎসমুখ। কিছুদিন বাদে এঙ্গেলসও এসে উপস্থিত হলেন। এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কস কিছুদিন লণ্ডনে কাটিয়ে এলেন। লণ্ডনে বৃটিশ ধনবিজ্ঞানী ম্যাককুলোক ও রিকার্ডোর রচনার সঙ্গে আরো গভীর পরিচয় হোল। পরিচয় হোল এঙ্গেলসের মারফৎ লণ্ডনের চার্টিস্ট ও সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে। ব্রুসেলসে এসে এঙ্গেলসের সহযোগিতায় একটা বড় কাজে হাত দিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস যুগ্মভাবে রচনা করলেন 'জার্মান ভাবধারা' (Die Deutsche Ideology)। রচনাটি 'পবিত্র পরিবার'-এর চেয়েও ব্যাপকভাবে বিতর্কমূলক। এখানে বিস্তৃত পরিসরে জার্মান দর্শন ও সমাজচিন্তার সমালোচনা স্থান নিয়েছে। এই রচনায় তৎকালীন জার্মান চিন্তাধারার প্রসঙ্গে এসেছেন ফয়েরবাথ, ব্রুনো বাউয়ের, ম্যাক্স স্টার্নার প্রমুখ তরুণ দার্শনিকেরা, এসেছেন মোসেস

হেস, কার্ল গ্রুন, অটোলুনিং, হারমান পুটম্যান এবং এঁদের সহযোগী চিন্তানায়কেরা।

প্রথম প্রসঙ্গ ফয়েরবাখকে নিয়ে শুরু। তবু ফয়েরবাখের বিশদ সমালোচনা স্থান পায়নি—স্থান পেয়েছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট ইতিমূলক ইতিহাস বিচার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ও প্রকারভেদে মানবসভ্যতার অগ্রগতির চিত্র, যে অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে রয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিন্যাসের আয়োজন।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফয়েরবাখের সমালোচনা প্রথমেই উল্লেখ্য। কেননা মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে মানুষ নিছক অনুভূতিময় নিষ্ক্রিয় সত্তা নয় এবং একান্তভাবেই বহির্জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের অনুগত নয় বরং অবিচ্ছিন্নভাবেই বিভিন্ন জাগতিক ঘটনা ও বস্তু মানুষ কর্তৃক গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়ে চলেছে। বহিঃপ্রকৃতির সমস্তটাই মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয় বরং যে সব ঘটনা বা বস্তু মানুষ নিজের আয়ত্তাধীন রেখে প্রয়োজনে সাধ্যমত ব্যবহার করতে পারে তার সব কিছুই মানুষের সমাজজীবনের অঙ্গীকৃত। ফলে মানুষের এই সমাজজীবন স্থাণু নয়, অনড়ও নয়। মানুষেরই সক্রিয় চেষ্টায় তার রূপ ও কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে।

ইতিহাসের এই পরিবর্তমাণ রূপ মার্কসীয় পরিভাষায় ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সহায়ক। এ গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রভাব যেমন মানুষের উপর সক্রিয়, মানুষও পক্ষান্তরে প্রকৃতি বা পরিবেশকে বদল করে নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ তার প্রাথমিক চাহিদা সংগ্রহ করে নেয়। এই সংগ্রহের কাজে মানুষকে বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। মানুষের সামনে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত তার প্রয়োজনীয় বস্তু জুগিয়ে দেয় না। এক এক যুগের এক এক ধরনের কলাকৌশলের প্রয়োগে বা বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞানে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে—যথা, পাথরের ধারালো হাতিয়ার, কাঠের উপরে ধাতুনির্মিত লাঙ্গল, হস্তচালিত তাঁত যন্ত্র, পরে বাষ্পীয় যন্ত্র। প্রত্যেকটিরই বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞান ও তৎসহ সামাজিক পটভূমিকা রয়েছে। এগুলির ব্যবহারে মানুষ যেমন প্রকৃতি বা পরিবেশকে আয়ত্ত করতে পারে, তেমনি পরিবেশের প্রভাবও মানুষকে গড়ে তোলে।

পরিবেশ মানুষকে ক্রমাগত উন্নত কলাকৌশলের সন্ধানে প্রেরণা দেয়—

পরিবেশ ও মানুষ উভয়তই সক্রিয়। ফলে, দেখা যায় প্রযুক্তিজ্ঞানের ক্রমাগত পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমশ বর্ধিত শক্তি ও পণ্য উৎপাদনের উন্নততর হাতিয়ারের সন্ধান পাচ্ছে। এ দু'য়ের যোগাযোগে সামাজিক বিন্যাসেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। পণ্য উৎপাদন প্রণালীর বদল হলে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেহারাও বদল হয়, নতুন শ্রম সংগঠনের প্রয়োজনও দেখা দেয়—ফলে সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন এসে পড়ে। ফয়েরবাখের নিষ্ক্রিয় মানুষ মার্কসের হাতে পড়ে সক্রিয় সামাজিক মানুষের ধারণায় পরিণতি পেয়েছে।

মার্কসীয় মতে সময়ের ব্যবধানে ঐতিহাসিক পর্যায়ে যে সব সমাজবিন্যাসের উদ্ভব হয় তারা প্রত্যেকেই স্ব-ক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শ (pattern) অনুযায়ী গঠিত এবং নিজস্ব পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। বিশিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থা-জাত সম্পর্ক অনুযায়ী সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সংস্রব গড়ে ওঠে; পক্ষান্তরে যা নাকি মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টির সাধারণ বিকাশেও সহায়তা করে। মার্কস অতি স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন যে, কোনো যান্ত্রিক কুশলতা বা মানবিক শ্রমনৈপুণ্য (technology and skill), ঐতিহ্য বা প্রাকৃতিক পরিবেশ—যথা, জাতি-বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক সংস্থান বা আবহাওয়া—এদের মধ্যে কোনো কিছুই সমাজবিন্যাস পরিগঠনের ভিত্তিস্বরূপ নয়। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী ব্যবস্থাই সমাজবিন্যাসের ভিত্তি নির্ধারিত করে দেয়। যেমন, সম্পত্তিজাত সম্পর্ক সামাজিক বিন্যাসের বিধিবদ্ধ প্রকাশ। এই সম্পর্কের চেহারা মোটামুটিভাবে দেখা যায় কৃষি-দাস ও কৃষি-মজুরের সঙ্গে সামন্ত প্রভুর সম্পর্কে, কারিগর ও চাষীর মধ্যকার সম্পর্কে, বেতনজীবী ও পুঁজির মালিকের সম্পর্কে।

বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী সংস্রব বা সম্পর্ক সমাজের আর্থিক বিন্যাস গড়ে তোলে, যে বিন্যাসে পণ্যোৎপাদন ও আয় বণ্টনের বিশিষ্ট কাঠামো রূপ পরিগ্রহ করে—যেমনভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে গড়ে উঠেছে দাস-ব্যবস্থা-জাত সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদী সমাজের চেহারা হোল উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাচ্যুত শ্রমিকের শ্রম বিনিময়ে বাজারের জন্য পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা—যে উৎপাদিত পণ্যের উপর শ্রমিকের দখল নেই এবং নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে শ্রমদানে পণ্যোৎপাদন শেষে উৎপাদনী ব্যবস্থার

সঙ্গে যার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এবং যে পণ্যের উৎপাদন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোনো নিম্নতম মুনাফা সংগ্রহের মানসেই আয়োজিত, উৎপাদক শ্রমজীবীর ব্যবহারের কারণে যার উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত হয়নি।

ঐতিহাসিক ও প্রচলিত সমাজবিন্যাসের এটাই হোল বিশ্লেষণ। সমাজের গতিশীলতার বিশ্লেষণে দেখা যাবে কেমনভাবে সমাজের আর্থিক বনিয়াদের পরিবর্তন ঘটে এবং ওই পরিবর্তনের ফলে সমাজের উপরিতলের আকৃতিরও বদল ঘটে—সামাজিক চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি ইত্যাকার সামাজিক ভাব-সম্পদেরও রূপ বদলায়।

মানুষ ও তার সমাজকে নিছক অর্থনৈতিক বনিয়াদে স্থাপন করে দেখার অর্থ মানবসমাজকে নিতান্তই আর্থিক-পরিবেশ-সর্বস্ববাদে নিমজ্জিত করা—এমন একটা প্রচলিত ধারণায় সহজেই আসা যায়। মার্কস কথিত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় আর্থিক-পরিবেশ-বাদ কোনো বক্তব্যই নয়। বরং পরিবেশের প্রভাবগত সম্পর্ককে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি-মানুষের বিশিষ্ট গুণরাজি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সঞ্চিত মানসসম্পদ্ সম্পর্কিত বক্তব্য রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ও উৎপাদন-গত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষ তার ইচ্ছা, সাধ্য, চিন্তার ক্রিয়াশীলতা, প্রেম, প্রীতি ইত্যাকার মানসসম্পদ্-এর যথাযথ স্ফুরণের সুযোগ পায় না—বস্তুত মানুষের অধিকার থেকে এইসব মানবিক সম্পদ্ কেড়ে নেওয়া হয়। এদের যথাযথ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধের সৃষ্টি হয়। একমাত্র আর্থিক বনিয়াদের বদল ভিন্ন এই সব প্রতিবন্ধের অপসারণ সম্ভব হয় না।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ বাধ্য হয়েছে বিভিন্ন অধিকারবঞ্চিত হয়েই বিশেষ বিশেষ সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে বাস করতে। ফলে, মানুষের সামাজিক জীবন আর্থিক-বনিয়াদ-গত সমাজ-সম্পর্কের আদর্শ (pattern) অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংগ্রহের অধিকার জনিত বনিয়াদে রচিত সামাজিক ব্যবস্থায় পণ্য কেনা-বেচার প্রতিযোগিতা, মুনাফা সন্ধান, শ্রমিকের শ্রমমূল্য বা বেতনের পরিসর, রাষ্ট্রীয় আইন, শিল্পকলা, ধর্ম বিশিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী রূপ নেয়। এই সামাজিক ঘটনা মার্কসের পরিভাষায় সামাজিক উপরিতলের (superstructure) অঙ্গীভূত। এই উপরিতলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক আদর্শ সমূহ, প্রত্যক্ষ অর্থ-নৈতিক সম্পর্ক জনিত কারণে যাদের আবির্ভাব। যথা, আইন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, নৈতিক অনুশাসনাবলী। দ্বিতীয় ভাগে মননশীলতা ও ভাবরাজ্যের সম্পদ্। যথা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, দর্শন—অর্থনৈতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য জনিত পরোক্ষ প্রভাবে যাদের উদ্ভব ও বিকাশ।

অর্থনৈতিক প্রভাব জনিত কারণে এদের উদ্ভব এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি ও কাঠামোর উপর উপরিতলের উপাদান হোল এরাই। উপরিতল এবং উপরিতলের ভিত্তি স্বরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এই সকল উপাদানের উপর বর্তায়। প্রচলিত সামাজিক শ্রেণী-ব্যবস্থাকে অটুট রাখায় সাহায্য করার মত শক্তি, হাতিয়ার ও নৈতিক পটভূমি এরাই জুগিয়ে থাকে। প্রচলিত আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে এদের সম্পর্ক থাকলেও উদ্ভবের পর এদের স্বাধীন বিকাশে বাধা নেই বরঞ্চ সময়ে সময়ে উভয়তই এরা সক্রিয় হতে পারে : একের উপর অপরের প্রভাব এসে পড়ে—পারস্পরিক সম্পর্কে একে অপরের প্রভাব এড়াতে পারে না। এখানেই মার্কস ও এঙ্গেলস নির্দিষ্টবাদী (Determinist) তাত্ত্বিক বিচ্যুতি থেকে এগিয়ে এসে উপরিতলের স্বাধীন বিকাশ ও ক্রিয়া-শীলতার ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। যেমন আমরা দেখি, সামাজিক বনিয়াদ ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন হলেও উপরিতলের কিছু অংশ দীর্ঘজীবী থাকে, পরিবর্তিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। যেমন, খৃষ্টীয় চার্চ—বহু শতাব্দীব্যাপী যার অধিষ্ঠান, যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দার্শনিক ভাবধারা ও প্রচলিত ঐতিহ্যধারা। সামাজিক বনিয়াদের বদল হলেও এদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

এর পরে মার্কস এসেছেন বাউয়ের-এর সমালোচনায়—'পবিত্র পরিবারে' যা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে বাউয়ের "সেণ্ট ব্রুনো" বলে অভিহিত। বাউয়ের-এর সঙ্গে এসেছেন ম্যাক্স স্টার্নার। মার্কস তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন, "সেণ্ট ম্যাক্স"। স্টার্নার হেগেলীয় দর্শনের মৌল চিন্তা ধরে এগিয়ে এসে অহংসর্বস্ব আত্মবাদী (egoist) মানবের ধারণায় এসে পৌঁচেছেন, যে ধারণা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদের জন্ম। বস্তুত, মার্কস স্টার্নারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদী মতবাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা পেয়েছেন।

স্টার্নারের বিখ্যাত বই, 'অহং এবং আত্মজন' (Der Einziger und

sein Eigentum)। এই গ্রন্থে স্টার্নার নীট্‌শীয় ধারণামত ব্যক্তির চরম আত্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠা ও অবাধ স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রচার করেছেন। স্টার্নার নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারার অন্যতম জনক। অবশ্য কোনো কোনো বিষয়ে মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে স্টার্নারের মিল রয়েছে। যেমন, নিছক আদর্শবাদ কিংবা ভাবপ্রবণ মানসিকতা জাত নৈতিক প্রেরণায় সামাজিক অমঙ্গলের নিরাকরণ সম্ভব হয় না ; অথবা স্টার্নার-কৃত গণতন্ত্রের সমালোচনা, যে গণতন্ত্রে তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার শূন্যগর্ভ আয়োজন। মার্কস ও স্টার্নার উভয়েই মনে করেন, স্বাধীনতা অর্থ সব রকম বন্ধনমুক্তি নয়, পরন্তু স্বাধীনতা মানুষকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার হাতিয়ার জোগায়। পুঁজিবাদী সমাজে অনেক বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এর কোনোটাই চরম প্রয়োজনে কার্যকর নয়—পুঁজিবাদী সমাজে হয়তো বাক্যের স্বাধীনতা থাকতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা এমন পর্যায়ে থাকে না যাতে সামাজিক মানুষের মৌল চাহিদা মেটে।

স্টার্নারের আরো সমালোচনায় মার্কস বলেছেন যে, স্টার্নারের অহং-এর ধারণা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বিশেষের অহং (ego) আসলে সামাজিক ফসল এবং অপরের সহযোগিতায় এর পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। সমাজের দায়িত্বচ্যুত অহং-এর বিকাশ নেই। একজন মানুষ তার সহকর্মীর সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্বে এবং কর্মের সহযোগিতায় যুক্ত থেকে নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে কিন্তু একাকী সমাজবিচ্ছিন্ন দায়িত্বহীন অবস্থায় তা সম্ভব হয় না। যুক্তি পরম্পরায় মার্কস বলেছেন যে, অহংবাদের (Egoism) উৎপত্তির কারণ সামাজিক, নৈর্ব্যক্তিক নয়।

পরিশেষে মার্কস তথাকথিত 'সঠিক সমাজতান্ত্রিকদের' (True Socialist) সমালোচনায় এসেছেন। এঁদের সমালোচনায় মার্কস নতুন দর্শনের সামাজিক ও আর্থিক ভিত্তির আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। জার্মান ভাববাদী দর্শনের গর্ভ থেকে 'ট্রু সোসিয়ালিস্ট'দের সমাজতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার জন্ম। অতীতের সমাজপ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই যে সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবনা সম্ভব এমন ধারণা 'ট্রু সোসিয়ালিস্ট'দের চিন্তায় ছিল না—তাঁদের মুখপত্রের নাম ছিল 'রাইন বার্ষিকী' (Rheinische Jahrbucher)। এঁদের মধ্যে মার্কস প্রথম সারিতে যাঁদের রেখেছিলেন তাঁরা হলেন মোসেস হেস, কার্ল গ্রুন ও হারমান পুটম্যান। তৃতীয় জন ছিলেন 'রাইন বার্ষিকী'র সম্পাদক।

সঠিক সমাজতন্ত্রবাদ—এই নামটির উদ্ভাবক কার্ল গ্রুন। মার্কস ও এঙ্গেলস নামটি ব্যঙ্গচ্ছলেই গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও সঠিক সমাজতন্ত্রবাদ—দুয়েরই জন্ম হেগেল ও ফয়েরবাখীয় চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের চরিত্র বিচার করেছেন ফরাসী বিপ্লব ও বৃটিশ শিল্প-অর্থনীতির আলোকে। 'সঠিক সমাজতন্ত্রী'রা কোনোমতেই হেগেলীয় দর্শনের বাইরে যাননি। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পটভূমি আন্তর্জাতিক কিন্তু সঠিক সমাজতন্ত্রীরা কেবলমাত্র জার্মান ইতিহাসেরই অবদান। হেগেলীয় দর্শনের প্রতিপাদ্যগুলি থেকে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের সমাজবাদের সূত্র ও শ্লোগান সংগ্রহ করেছেন। মার্কস সমালোচনায় বলেছেন, এঁদের চিন্তাধারায় গ্রথিত আছে কিছু মানবিকতাবোধ, সামান্য সম্পত্তি-সম্পর্কিত ধারণা, কিছু নির্বিত্ত শ্রেণীর জন্য বিলাপ, শ্রমিক সংগঠনের কথা, স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীনের সমাজ-উন্নয়নের চিন্তায় সঙ্ঘ বা সমিতি গঠনের কথা, আর অর্থনীতি শাস্ত্রে ও সমাজবিদ্যায় ব্যাপক চর্চার অভাব।

জার্মান চিন্তাধারাকে মার্কস চার ভাগে ভাগ করেছিলেন—চারটি ধারায় এর বিকাশ বিশ্লেষিত হয়েছিল। ফয়েরবাখ, ব্রুনো বাউয়ের, ম্যাক্স স্টার্নার ও 'সঠিক সমাজতান্ত্রিক'—এই চারটি ধারায় বিকশিত জার্মান দর্শনের যথাযথ সমালোচনার চেষ্টায় মার্কসীয় দর্শনের সম্পূর্ণ অবয়ব রচিত হয়েছে। এঁদের সমালোচনা থেকে পর্যায়ক্রমে যুক্তিগ্রাহ্য এমন এক ব্যাপক দর্শনের উদ্ভব হোল যা ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতির সুসমঞ্জস এক সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পেরেছে।

সমাজতন্ত্রের পটভূমিকায় মার্কসীয় চিন্তার শুরু হয়েছিল ১৮৪৩-এ, মার্কসের প্যারিসে বসবাস কালে। ১৮৪৬-এ ব্রুসেলসে বসবাস কালে 'জার্মান ভাব-ধারা'য় মার্কসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সমস্ত সাধারণ সূত্রগুলি গ্রথিত হয়ে যায়।

সাম্যবাদী ইস্তাহার

মার্কস ও এঙ্গেলসের অবস্থিতির ফলে ব্রুসেলস শহর য়ুরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠলো। ব্রুসেলস শহরের অবস্থানই ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর যোগকেন্দ্র-স্বরূপ। জার্মানীর পলাতক শ্রমিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের প্যারিস আগমনের পথেই পড়ে ব্রুসেলস। মার্কস এই পারিপার্শ্বিকের সুযোগ ছাড়লেন না। য়ুরোপের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে উঠলো। মার্কসের ব্রুসেলস আগমনের বছরেই জার্মানীর সাইলেশীয় প্রদেশে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ চরম আকার নেয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মারফৎ জার্মানীর বিভিন্ন প্রদেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা নানাভাবে প্রচারিত হতে শুরু হয়েছিল, ফলে ক্রমশই শ্রমিক আন্দোলন সচেতন শ্রেণী-সংগ্রামের স্তরে উঠে আসতে থাকে।

ব্রুসেলসে মার্কস একাধিক সমিতি গড়ে তুললেন। শহরের গণতান্ত্রিক সমিতির মার্কস উপ-সভাপতি। আর একটি শ্রমিক সংস্থাও ছিল—জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ। মার্কসের নেতৃত্বে ওই সঙ্ঘের পরিচালনায় 'ডয়েশে ব্রুসেলের ৎসাইটুঙ' নামে সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ শুরু হোল। অর্থনীতির চর্চায় মার্কস এ সময়ে গভীরভাবে মন দিলেন। লেখা ও পড়ার সঙ্গে বক্তৃতামঞ্চকেও মার্কস দূরে রাখলেন না। বিভিন্ন শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সমাবেশে অর্থনীতি, দর্শন ও রাজনীতির সমাজতন্ত্রসম্মত ব্যাখ্যার প্রচারে মন দিলেন। এই সব সমাবেশে মার্কসের বক্তব্য নিছক পেশাদারী বক্তার ঢঙে বিবৃত হোত না। শিক্ষাদানের পদ্ধতি মেনে জাতশিক্ষকের মতই মার্কস তাঁর বক্তব্য রাখতেন। অবশ্য বৃহৎ সমাবেশে জনপ্রিয় বক্তার ভূমিকায় মার্কস অসার্থক, বরং তা পারলে এড়িয়েও যেতেন কিন্তু আন্দোলনের সৈনিক, ক্যাডার ও নেতা তৈরীর কাজে শিক্ষাদানের ব্যাপারে মার্কস অতুলনীয় শিক্ষক ছিলেন।

এই সময়ে লণ্ডনে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন সমিতি গড়ে উঠেছিল। তাদের একটির নাম—Fraternal Democrats। বিভিন্ন দেশের পলাতক বিপ্লবীরা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য

এই সমিতি গড়ে তোলেন। এ ছাড়াও আরো দুটি সমিতি ছিল, German Communist Workingmen's Club আর London Corresponding Committee। শেষোক্ত এই কমিটীর সঙ্গে মার্কসের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। প্যারিস আর জার্মানীর বিভিন্ন সাম্যবাদী চিন্তানায়কদের সাম্যবাদ সম্পর্কিত মতবাদ মার্কস নানা নিবন্ধে ও পত্রের মারফৎ খণ্ডন করে London Corresponding Committee-র সদস্যদের কাছে পাঠাতেন।

এই সব সমিতির জন্মেরও আগে প্যারিসে ফ্রান্সপ্রবাসী জার্মান বিপ্লবীরা এক সংগঠন গড়ে তোলেন, নাম ছিল Exiles' League (1834)। দু'বছর বাদে এই সমিতি থেকে চরমপন্থীরা বেরিয়ে এসে আর একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। তার নাম হোল, Federation of the Just, এর অধিকাংশ সদস্যই নির্বিত্ত সমাজের মানুষ। ফ্রান্সের বিপ্লবী আবহাওয়ায় কয়েক বছর বাদেই এই সমিতির সংগঠন বৃদ্ধি পেতে দেখা গেল। ফরাসী সাম্যবাদী নেতা বাবুফের মতবাদের প্রেরণা সে সময়ে এঁদের মূলধন ছিল। প্যারিস তখন য়ুরোপীয় বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। প্যারিসে ছিল একাধিক গুপ্ত সমিতি। ১৮৩৯-এর ফ্রান্সের মে-অভ্যুত্থানে ফেডারেশনের কর্মীরা ফরাসী জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াইয়ের পথে নেমেছিল। পরে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ধাক্কায় ফেডারেশনের নেতারা ফ্রান্স ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসতে বাধ্য হলেন। কার্ল শেপার (Karl Schapper), হাইনরিখ বাউয়ের (Heinrich Bauer) ফেডারেশনের প্রথম সারির নেতা। লণ্ডনে চলে এলে ওঁরা ওই শহরকেই বিপ্লবের কর্মকেন্দ্র করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন জোসেপ মোল। জোসেপ মোল ছিলেন ঘড়ি নির্মাতা শ্রমিক। এঁদের সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন, 'নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যথার্থ বিপ্লবী বলে প্রথম আমি যাঁদের দেখি তাঁরা হলেন এই তিন ব্যক্তি, যদিও এঁদের মতবাদের সঙ্গে আমাদের চিন্তাধারায় কিছু পার্থক্য ছিল তবু আমাদের সেই নবীন বয়সে এই তিন ব্যক্তির অসাধারণ প্রভাব আমরা তুচ্ছ করতে পারিনি।"[১]

লণ্ডনে ফেডারেশনের নতুন কর্মকাণ্ডে দেশবিদেশে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হতে শুরু হয়। জার্মানী ও সুইৎসারলাণ্ডে সমিতির বড় শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে। প্যারিসে ফেডারেশনের কেন্দ্র যতদিন ছিল তার আন্তর্জাতিক চরিত্র

১ Riazanov : *Communist Manifesto*, 1944, p. 2

ততদিন বিস্তৃত হতে পারেনি। কিন্তু লণ্ডনে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে বিস্তৃত যোগাযোগের সুযোগ এসে গেল—ডাচ, রুশ, হাঙ্গেরীয়, বোহেমীয়, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় বিপ্লবীরা সন্ধান পেয়ে ফেডারেশনের প্রভাব স্বদেশেও টেনে নিয়ে গেলেন। ১৮৪৭-এ সমিতির নতুন নামকরণ হোল : Communist Workers' Educational Society। সমিতির সদস্যপত্রে কুড়িটি ভাষায় মুদ্রিত থাকতো : 'All Men Are Brothers'। এই নামে ফেডারেশন প্রকাশ্য কাজকর্ম সমাধা করতো। আইনবিরুদ্ধ কাজের ব্যাপারে একটা গোপন বিভাগও ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে সমিতি যেসব ছোট ছোট শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিল তাদের বলা হোত 'কমিউন'। মার্কস ও এঙ্গেলসের এই সমিতির উপর-মহলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও লণ্ডন কমিউনের সঙ্গে একটা ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল London Corresponding Committee মারফৎ। ফেডারেশনের কাজকর্মের খবরাখবর মার্কস ও এঙ্গেলস নিয়মিতভাবে পেতেন। লণ্ডনে ও প্যারিসে ফেডারেশনের নেতারাও সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত মার্কস ও এঙ্গেলসের মতামত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিভিন্ন বিতর্কমূলক নিবন্ধে মার্কসের শ্রেষ্ঠত্ব বিপ্লবী মহলে ক্রমশই স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। লণ্ডন কমিউনের নেতারা মার্কস ও এঙ্গেলসকে সমিতির আওতায় আনার মনস্থ করেন। লণ্ডন থেকে জোসেপ মোলকে ব্রুসেলসে পাঠানো হোল। মোল মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্যারিসে এঙ্গেলসের কাছে গেলেন। দুজনকেই মোল ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। মোল যথাসময়েই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন কেননা একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক সংস্থার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস এ সময়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন এবং ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসকে ফেডারেশনের আগামী সম্মেলনে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হোল।

১৮৪৭-এর ১লা জুন ফেডারেশনের প্রথম কংগ্রেস বসে। মার্কস ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। প্যারিসে এক কমিউনের প্রতিনিধি হিসেবে এঙ্গেলস যোগ দিয়েছিলেন। নতুন পথে সংগঠন গড়ে তোলার আলোচনা হোল সম্মেলনে। পূর্বের গুপ্ত আন্দোলনের সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করে প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প নেওয়া হোল—'আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদকল্পে—পরিবর্তে স্থাপিত হবে নির্বিত্ত শ্রেণীর

রাষ্ট্র—সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন সামাজিক অবস্থার উদ্বোধন ঘটাতে হবে।'[১] এই সম্মেলনেই সংস্থার পুনরায় নতুন নামকরণ করা হোল 'কমিউনিস্ট লীগ'। সম্মেলনে লীগের নতুন সংবিধান গৃহীত হোল। কমিউনিস্ট লীগ সাম্যবাদী বিপ্লবীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা।

কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস বসলো ওই বছরেই (১৮৪৭) নভেম্বরের শেষে। এই বারের সম্মেলনে মার্কস উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য, রাজনৈতিক বিতর্কে মার্কসের বক্তৃতা। মার্কস তাঁর সমাজতাত্ত্বিক দর্শন ও অর্থনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন। এঙ্গেলস ছাড়া মার্কসের সমকক্ষ একজনও ছিলেন না ওই সম্মেলনে। দশদিনব্যাপী একটানা আলোচনার মধ্যে মার্কস নিজস্ব প্রজ্ঞার ব্যাপ্তি ও বিস্তারে, গভীরতায় সম্মেলনকে ভরে তুলেছিলেন। সম্মেলন থেকে মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর যুগ্মভাবে দায়িত্ব অর্পিত হোল সাম্যবাদী ইস্তাহার রচনার।

১৮৪৮-এর য়ুরোপ জুড়ে ব্যাপক বিপ্লবের শুভ মূহূর্তে লণ্ডন থেকে মুদ্রিত হয়ে বেরুল মার্কস-এঙ্গেলস রচিত ওই সাম্যবাদী ইস্তাহার—'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'।

এর আগে ১৮৪৭-এর অক্টোবরে প্রথম কংগ্রেসের পর প্যারিস শহরে কমিউনিস্ট লীগের এক সভায় এঙ্গেলসের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল সমাজ-তন্ত্রের মূলসূত্র রচনার। এতদিন নানা বিপ্লবী চিন্তানায়কদের রচনায় সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। বাবুফ, ভাইটলিং, বাকুনিন, ব্ল্যাঙ্কি, ওয়েন, মোসেস হেস ও আরো অনেক বিপ্লবীর চিন্তায় সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা শোনা যেত। কমিউনিস্ট লীগ আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের যথার্থ মূলসূত্র রচনার প্রয়োজন অনুভব করে। লীগের সভায় মোসেস হেস রচিত এক খসড়া আলোচিত হয়েছিল। সেই সভায় এঙ্গেলসের তীব্র সমালোচনায় হেস-এর খসড়া গৃহীত হতে পারেনি। উপরন্তু এঙ্গেলসের উপর নতুন করে রচনার দায়িত্ব অর্পিত হোল। এঙ্গেলস মোটামুটি একটি ছক তৈরী করে ফেলেছিলেন, যার নাম ছিল—Confession of Faith। পরবর্তীকালে যখন মার্কসের উপর দায়িত্ব এসে পড়ে, মার্কস

১ Article 1. Rules and Coustitution of the Communist League.

এঙ্গেলসের Confession of Faith থেকেই মূল আলোচনার সূত্র সংগ্রহ করেছিলেন। 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' তৈরী করতে মার্কসের ছয় সপ্তাহের বেশি সময় লাগেনি।

মূল জার্মান ভাষায় বারো হাজার শব্দের এই ছোট্টো রচনাটি (Communist Manifesto) বাক্‌ভঙ্গিমায়, নাটকীয়তায়, বিতর্কের দীপ্তিতে বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ রচনা। যে রাজনীতি, দর্শন, সমাজনীতি এই ছোট রচনার মধ্যে স্ফুরিত, একশো বছর পরেও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে তা আজো উদ্দীপিত করে তুলছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যে, রচনাটির এই উদ্দীপনাময়ী শক্তি একশো বছর আগে যতখানি ছিল আজো তা সমপরিমাণে অটুট আছে। সম্ভবত বাইবেলের পরেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মুদ্রিত পুস্তক মার্কস ও এঙ্গেলসের 'সাম্যবাদী ইস্তাহার'।

সাম্যবাদী ইস্তাহারের প্রথম ভাগের উপনাম : "বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়"। এই ভাগে ভঙ্গুর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদের জন্মের কাহিনী বলা হয়েছে। জন্মের পরেই বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থা মানবের পণ্য উৎপাদন ক্ষমতাকে আকাশচুম্বী করেছে। মার্কস এখানে ধনতন্ত্রের যুগোচিত অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন: 'প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগের সকল রকম উৎপাদন ব্যবস্থা একত্রিত হলেও তা ধনতন্ত্রের শক্তি ও উৎপাদন সাধ্যের কাছাকাছি আসতে পারবে না। এই ধনতন্ত্র জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামগ্রিক কাঠামোর বদল ঘটিয়ে শিল্পযুগে পুঁজির সামাজিক চরিত্র শ্রমবেতন ও নতুনতর আর্থিক নিয়মকানুন গড়ে তুলেছে।' এই হোল ধনতন্ত্রের গঠনকর্মের দিক্। কিন্তু পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপও মার্কসের রচনায় সমভাবে উদ্ঘাটিত : 'এই যুগে অকল্পনীয় হারে পণ্যোৎপাদন ও সম্পদ্ বাড়লেও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়নি—আর্থিক পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে সংকটাবর্তের সূচনা হয়েছে। নতুন কাঠামোয় শ্রমবেতনের নিয়মে মুক্ত ও স্বাধীন শ্রমিকের সৃষ্টি হলেও শোষণের অবসান ঘটেনি।'

বিশ্লেষণে আরো বলা হয়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজে পণ্য উৎপাদন ও সম্পদ্-সঞ্চয় একটি স্তরে পৌছুবার পর প্রচলিত আর্থিক কাঠামোয় ক্রমবর্ধিত উৎপাদন সাধ্যের সঙ্গে সমাজের ক্রমসংকুচিত ক্রয়শক্তির জন্ম হয়—এই বিরোধ থেকেই আর্থিক সংকটের সূচনা। পুঁজিবাদ নিজের বিপদ নিজেই আহ্বান করে

আনে—পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিরোধও এগিয়ে চলে। আসলে উৎপাদনী অবস্থার বিরুদ্ধে উৎপাদনী শক্তির এই বিদ্রোহ, এই অন্তর্বিরোধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা যত দ্রুত হয়, পুঁজিবাদের আসন্ন মৃত্যু তত ত্বরান্বিত হতে থাকে।

এই ইস্তাহারে ধনতন্ত্রের অন্ধকার দিক্ দেখিয়ে পরিবর্ত হিসেবে অন্য কোনো সমান্তরাল আদর্শ সমাজব্যবস্থার ছবি তুলে ধরা হয়নি, পরন্তু বলা হয়েছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার গতিশীলতা থেকেই ঘটনাক্রমে ধ্বংসাত্মক শক্তির জন্ম হবে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছুবে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবস্থাজাত সম্পদ্ উৎপাদন যথোপযুক্তভাবে বণ্টনের সুযোগ না পেয়ে নতুনভাবে সামাজিক পুনর্বিন্যাসের প্রেরণা জোগাবে। পুঁজিবাদ প্রচুর সম্ভাবনা ও আকাশচুম্বী আশার জনক কিন্তু এই সম্ভাবনা ও উচ্চাশা পুঁজিবাদোত্তর সমাজেই ফলবতী হতে পারে, পুঁজিবাদী সমাজে নয়।

মার্কস সমকালীন অবস্থাকে ইতিহাসের গতিশীল প্রবাহের প্রেক্ষাপটে স্থাপনা করে পুঁজিবাদের উভয়-সংকটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের গতিপথকে মার্কস পর্যায়ক্রমিক পণ্যোৎপাদন প্রণালী ও তজ্জনিত বিভিন্ন শ্রেণী-আধিপত্যের প্রভাবজাত সমাজপ্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে দেখিয়েছেন। মার্কস বলেছেন যে, প্রতি যুগের অবস্থান্তর নতুন আর্থিক সমাজজীবনের উদ্বোধন ঘটিয়েছে—অধিকতর উৎপাদনক্ষম সামাজিক শক্তির জন্ম দিয়েছে—নতুনতর সমাজ-সম্পর্কের (new system of human relationship) সৃষ্টি করেছে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য অতি সরল গিল্ডপ্রথায় শিল্পোৎপাদন বা হস্তশিল্প চালিত কারিগরপ্রধান পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা, কিন্তু পরবর্তী ধনতান্ত্রিক যুগে পুঁজিবাদী মালিকের অধীনে বৃহৎ যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের মালিকানাচ্যুত নির্দিষ্ট বেতনে উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায় অধ্যুষিত সমাজ ব্যবস্থা।

মার্কস দেখিয়েছেন, এক যুগ থেকে আরেক যুগের রূপান্তর ঘটেছে শাসক-শক্তি ও সমাজের নতুন শক্তির মধ্যে বিরোধের মাধ্যমে। সকল কালেই নতুন সামাজিক শ্রেণীর লক্ষ্য সমাজের পরিচালনা নতুন পণ্য ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা, কেননা পুরাতন পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থাজাত সামাজিক প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান নতুন পণ্যোৎপাদন প্রণালীর প্রসারের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন ব্যবস্থাকে পুরাতন প্রণালী সহজে পথ ছেড়ে দেয় না—পুরাতন সামাজিক প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পুরাতন শাসকশ্রেণীর জীবিতকালের সহায়ক শক্তি হিসেবে সক্রিয় থাকে।

সমকালীন পুঁজিবাদী সমাজ নতুন বিত্তহীন শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পর্বান্তর ঘটানোর দায়িত্ব ওই শ্রেণী নেবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পদ্ বৃদ্ধি যতই ঘটবে সমতালে বিত্তহীন মানুষের সংখ্যাও বাড়বে। সমাজে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই যুগের পর্বান্তর ঘটাতে বিত্তহীন শ্রেণীই এগিয়ে আসবে, কেননা পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার দীর্ঘ অবস্থিতি নির্বিত্ত শ্রেণীর সমাজজীবন ক্রমশই সংকটাপন্ন করে তোলে। শিল্পায়নের অগ্রগতির ধাক্কায় উৎপাদিত সম্পদ্ থেকে শ্রমিক-শ্রেণী ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং শিল্পমালিক গোষ্ঠীর বিরোধী শক্তি হিসেবে বর্ধিত হয়। ধনতন্ত্র আপন হত্যাকারীকেই জন্ম দিয়ে লালন পালন করে।

অতএব একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধনতন্ত্র থেকে নতুনতর সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা স্বতস্ফূর্তভাবে জন্ম নেবে না, ধনতন্ত্রের জীবন যতই দীর্ঘ হতে থাকবে শোষণের ফলে শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার চাপ ততই বাড়বে। শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবে। এই জাতীয় শ্রেণী-সংগ্রাম কেবল ধনতন্ত্র যুগের বৈশিষ্ট্য নয়—এই জাতীয় শ্রেণী-সংগ্রাম প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের পর্বান্তরকালে তৎকালীন শাসকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যে ঘটে থাকে এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রতিটি যুগে সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থার পর্বান্তর ঘটে। ধনতন্ত্রের যুগে এই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেবে সাম্যবাদীরা। এই সূত্রে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অর্থনীতি, সামাজিক বিধান, রাষ্ট্রীয় বিধান, প্রচলিত নৈতিক অনুশাসন ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটবে, কেননা উপরিউক্ত ব্যবস্থাদির মারফৎ বুর্জোয়া সভ্যতা আপন অস্তিত্ব বজায় রাখে। মানুষের চিন্তা, ধারণা ও মানস-সম্পদ্ সর্বকালেই মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থার শর্তাধীন। মানব-অস্তিত্বের পরিবেশগত অবস্থার বদল ঘটলেই এ সবের বদল ঘটে। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নতুনতর সামাজিক বিধান, রাষ্ট্রীয় বিধান, অর্থনীতি ও নৈতিক অনুশাসন প্রচলিত হবে।

এই বদল ঘটানোর ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাই প্রধান—নেতৃত্বের স্থান

সাম্যবাদীদের। সাম্যবাদীরা কেবল শ্রমিকশ্রেণীর তাত্ত্বিক বন্ধু বা উপদেষ্টা নয়—শ্রমিকশ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের জন্য সাম্যবাদীদের সযত্ন প্রয়াস কেবলমাত্র এই কারণেই নয় যে, সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের চেয়ে বেশী মানবকল্যাণকারী ও ন্যায়তন্ত্রী বরং একমাত্র সাম্যবাদীরাই সমাজপ্রগতির তত্ত্বগত দিক্ উদ্ঘাটিত করে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, সমাজপ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্রের অনিবার্য আবির্ভাব ঘটবে। অবশ্য এই সঙ্গে বলা যাবে না যে, মানবপ্রগতির শেষ আশ্রয় সমাজতন্ত্রে। সমাজতন্ত্র কেবল ধনতন্ত্রের পরবর্তী অবস্থা।

সাম্যবাদী ইস্তাহারে মার্কস, ইতিহাস দর্শন অর্থনীতি রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের একত্র সম্মিলন ঘটিয়েছেন।

আন্দোলনে নেতৃত্ব

সাম্যবাদী ইস্তাহার বেরুল লণ্ডন থেকে। তার কয়েকদিন বাদেই ফ্রান্সে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো বিপ্লব। চব্বিশে ফেব্রুয়ারি (১৮৪৮) প্যারিসের রাস্তায় আগুন জ্বলে উঠলো। দেখতে দেখতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত য়ুরোপে। তেসরা মার্চ কোলোনের পথে পথে বিক্ষুব্ধ জনতার অভিযান। তার দশদিন বাদে ভিয়েনা আর দু'সপ্তাহ বাদে বার্লিনে বিক্ষোভের ত্বরিত পদধ্বনি শোনা গেল। মার্কস এতদিন ব্রুসেলসে ছিলেন। ব্রুসেলসে মার্কসের অবস্থিতি কর্তৃপক্ষের কাছে বিপজ্জনক বলে মনে হোল। সাম্যবাদী ইস্তাহারের রচয়িতা কমিউনিস্ট লীগের নেতা কার্ল মার্কস বেলজিয়ম থেকে বিতাড়িত হলেন। প্যারিসের অগ্নিগর্ভ পরিবেশে মার্কস গিয়ে হাজির হলেন। ফ্রান্সের বিদ্রোহী জনতার নেতা ফার্দিনান্দ ফ্লকন (Ferdinand Flocon), লুই ব্লাঙ্ক (Louis Blanc)। বিদ্রোহী সরকারের প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে এঁরা ফ্রান্সে মার্কসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন। ফ্রান্সের বিক্ষুব্ধ পরিবেশে কমিউনিস্ট লীগের সংগঠন ঢেলে সাজানো হোল। মার্কস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। সাম্যবাদী ইস্তাহার রচনার খ্যাতি মার্কসকে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রধানতম নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এর আগেই।

সমস্ত য়ুরোপ জুড়ে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠলো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহর। প্যারিস য়ুরোপের পলাতক বিপ্লবী নেতাদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। উত্তেজনার অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে প্যারিস শহরের প্রায় সকল নেতাই তখন সফল ভবিষ্যতের আশায় উদ্দীপিত। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই পরিবেশের বৈজ্ঞানিক বিচারে স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। মার্কসের সামনে বিপ্লব-পরবর্তী ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর ছিল না। বিপ্লবের মূলশক্তি প্রলেতারীয় জনগণ হলেও এই শ্রেণীর আবির্ভাবের সামাজিক কারণ হোল সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেও শোষিত জনগণের হাতে সমাজবিপ্লবের নেতৃত্ব থাকছে না। কিন্তু য়ুরোপীয় বিপ্লবের সেই অতি-নাটকীয় মুহূর্তে মার্কসের উপলব্ধি কাউকেই প্রভাবিত করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের ভবিতব্য :

এপ্রিল মাসের নির্বাচনে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পতন। লুই ব্লাঙ্ক পলাতক হলেন, মে বিক্ষোভ দমিত হোল। কিন্তু বিপ্লবের মধ্যবর্তী অবস্থায় উত্তেজনা ও উল্লাসের তুলনা ছিল না। প্যারিসের পথে পথে স্বতস্ফূর্ত জনতার শোভাযাত্রা, সভাসমিতি, বিপ্লবের শুভ কামনায় বৃক্ষরোপণ—উন্মাদনা আর উচ্ছ্বাসের ভারে বিপ্লবের সাংগঠনিক শক্তি বিপর্যস্ত। এর ঢেউ গিয়ে লাগলো য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে, শহরে, জনপদে।

তখন প্যারিস শহরে ছিলেন সাম্যবাদী জার্মান কবি হারভেগ—শ্রমিকনেতা বাকুনিন। হারভেগ পরিকল্পনা দিলেন ফ্রান্সে আশ্রয়প্রাপ্ত জার্মান বিপ্লবী ও শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে প্রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করা হবে। হারভেগের সঙ্গে যোগ দিলেন বাকুনিন, লাইবনেক্ট। মার্কসের প্রচণ্ড বিরোধিতা ছিল এই ধরনের রোমান্টিক পরিকল্পনায়। যেখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান সেনাবাহিনী প্রস্তুত, সেখানে দেশের সীমারেখা অতিক্রম করে মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর দেশ-দখলের আকাঙ্ক্ষা বাতুলের স্বপ্ন। মার্কস বিরোধিতা করলেন। মার্কসের পরিবেশ বিচার ও তত্ত্ব বিশ্লেষণে কিছুতেই তিন নেতা কর্ণপাত করলেন না, ফলে এক হঠকারী মুহূর্তে বিপ্লবী বাহিনীর সাড়ম্বর রণযাত্রা জার্মান সীমান্তে ঝড়ের মুখে কুটোর মত ভেসে গেল।

উপরন্তু, মার্কস এক ফতোয়া রচনা করলেন জার্মান সাম্যবাদীদের উদ্দেশে। ফতোয়াটি ছিল: 'জার্মানীতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি' (মার্চ ১৮৪৮)। সেই মুহূর্তে কোন্ কোন্ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হতে পারে জার্মান সাম্যবাদীদের প্রতি তারই নির্দেশ ছিল। গণবিক্ষোভের নিম্নতম লক্ষ্য নির্ধারিত করে মার্কস জার্মানীর বিপ্লবে অংশ নিলেন। ফতোয়ায় নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি ছিল—

রাজতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা,
জমিদারী সমূহের রাষ্ট্রীয়করণ,
স্থল ও জলপথের যানবাহন রাষ্ট্রীয়করণ,
উত্তরাধিকার আইনের সংকোচন ও পরিবর্তন,
ক্রমবর্ধিত হারে আয়কর নীতি ও আবগারী শুল্কের অপসারণ,
রাষ্ট্রের পরিচালনায় কারখানার প্রতিষ্ঠা,

কর্মজীবীর চাকুরির স্থায়িত্ব,
দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও রোগের বিরুদ্ধে চাকুরিজীবীর বীমার ব্যবস্থা,
বিনা বেতনে শিক্ষার প্রসার।

নতুন ফতোয়াটি জার্মান বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে বিতরিত হয়। যথাযথ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনার এই প্রথম ঐতিহ্য গড়ে উঠলো মার্কস-এর নেতৃত্বে। এক পুরুষ পরে জার্মানীর সামাজিক আইনকানুনে মার্কস-কর্তৃক উত্থাপিত গণদাবিগুলির প্রভাব লক্ষণীয়। মার্কসের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বাস্তবমুখিনতা কোনো রোমান্টিক ভবিষ্যতের কষ্টকল্পনায় গড়ে ওঠেনি।

ইতোমধ্যে সমস্ত য়ুরোপ জুড়ে বিপ্লবের দানব জেগে উঠেছে। ইংলণ্ডও বাদ যায়নি। '৪৮-এর ফেব্রুয়ারির ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যের ঢেউ বৃটেনের চার্টিস্ট আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। সরকারী প্রতিরোধের ফলে ইংলণ্ডের শহরে বন্দরে জনতার বিক্ষোভ তুমুল আকার নিয়েছিল। আর্নেস্ট জোন্স্, জর্জ হারনী, ফিয়ারগুস ও'কোনোর প্রভৃতির নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ প্রায় বিপ্লবের পর্যায়ে উঠে এল। গ্লাসগোর পথে পথে, ম্যাঞ্চেস্টারের কলে-কারখানায়, লণ্ডনের মাঠে-ময়দানে-পার্কে সভা-সমিতি-শোভাযাত্রায় শ্রমিক ও জনতার মুখে একই স্বর : "হয় রুটি নয় বিপ্লব"।

১৩ই মার্চের ভোরে যেদিন ইংলণ্ডে চার্টিস্ট নেতাদের নেতৃত্বে কেনসিংটন মাঠে শ্রমিক ও জনতার সর্বোত্তম সমাবেশ—ঠিক সেইদিনই অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার মানুষ বিপ্লবের উত্তেজনার চরম মুহূর্তে উঠে এল। পথে পথে 'লা-মার্সাই' গান গেয়ে, ফরাসী বিপ্লবের তিনরঙা পতাকা উড়িয়ে জনতার দখলে এল ভিয়েনা শহর। সরকারী সেনার বিরোধিতা চূর্ণ করে বিক্ষুব্ধ জনতা রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক শহর ছেড়ে পালালেন। রাজপ্রাসাদ থেকে ঘোষণায় সংবাদপত্রের উপর সমস্ত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হোল, জাতীয় পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহূত হোল। তিনদিন বাদে সেই অরাজকতার মধ্যে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী গোপনে ভিয়েনা ত্যাগ করলেন।

জার্মানীতেও সেই একই পরিস্থিতি। বার্লিনের পথে, শোভাযাত্রার মুখে, হোটেলে, সরাইখানায় মার্সাই সংগীত আর 'ভিভা-লা-ফ্রাঁস', 'ভিভা-লা-রিপাবলিক' ধ্বনি মুখরিত। কোলোনের পথে পথে উদ্দীপ্ত বিক্ষোভ-যাত্রায়

অগুনতি মানুষের মাথা ঢেকে যেত ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকায়। শ্রমিক-জনতার সঙ্গে ছাত্র-অধ্যাপকের মিলিত অভিযানে অভাবনীয় পরিস্থিতি।

১৮ই মার্চ, ১৮৪৮ বার্লিনে অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারে হাজার হাজার জনতার সমাবেশ। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত। সেখানেই শুরু হোল সেনা বাহিনীর গুলিবর্ষণ। ক্ষিপ্ত জনতার তীব্র রোষে সমগ্র বার্লিন রণক্ষেত্রে পরিণত হোল। পথে পথে ব্যারিকেড আর গুলি বিনিময়। রাস্তার পাথর তুলে জনতার ব্যারিকেড রচনা—ব্যারিকেডের উপরে ত্রিবর্ণ পতাকার অবস্থান। জনতার হাতে বিচিত্র সব অস্ত্র—রাইফেল, পিস্তল, শটগান, শাবল, কুড়ুল, পাথরটুকরো। অপরদিকে সুসজ্জিত সেনা বাহিনী। রক্তস্নানে বার্লিনের মানুষ ও জনপথ বিচিত্র মূর্তি ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে মার্কসের রচনায় (রেভোলিউশন অ্যাণ্ড কাউন্টার রেভোলিউশন ইন জার্মানী ইন এইটিন-ফরটি-এইট) জার্মানীর এই বিপ্লব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

বিপ্লবের বিপুল তরঙ্গে যখন জার্মানীর বিক্ষুব্ধ জনতা দোলায়িত মার্কস ও এঙ্গেলস তখন প্যারিস শহরে। সাধারণ বিক্ষোভের স্তর থেকে জার্মানীর অবস্থাকে পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ বৈপ্লবিক স্তরে তুলে আনার সম্ভাব্য চেষ্টায় মার্কস মন দিলেন। য়ুরোপীয় বিপ্লবের সেদিন যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল তা হোল সমাজবিজ্ঞানসম্মত কৌশলী নেতৃত্ব। ১৭৮৯-এর ব্যর্থ ফরাসী বিপ্লব থেকে এই শিক্ষা মার্কস পেয়েছিলেন। বিপ্লবের লক্ষ্য হারিয়ে পরবর্তীকালে নেতৃত্বের ব্যর্থতায় ফরাসী বিপ্লব সাধারণ জনতার গভীর হতাশার কারণ হয়ে ওঠে।

বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রথম করণীয়, বিপ্লবের লক্ষ্য স্থির করা। লক্ষ্যহীন বিপ্লব নিছক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। পূর্বকথিত ইস্তাহারে জার্মানীর বিপ্লবের নির্দিষ্ট লক্ষ্য কী হওয়া উচিত মার্কস স্থির করে নিতে পেরেছিলেন। এবার প্রয়োজন নেতৃত্বের। শ্রমিক নেতা ভোলফ্ (Wolff), বাউয়ের, মোল (Moll), শেপার (Schapper) প্যারিস শহরে এসে জড় হলেন। জার্মান বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্যারিসে কমিউনিস্ট ক্লাবের পত্তন হোল। ক্লাবের চেষ্টায় বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশ প্রবাসী জার্মান শ্রমিক বিপ্লবের মন্ত্র নিয়ে চুপি চুপি জার্মানীতে ঢুকে পড়লো। দেখা গেল জার্মানীর প্রতিটি বিক্ষুব্ধ কেন্দ্রে স্বদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকেরা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস আশ্রয় নিলেন রাইনল্যাণ্ডে। বিভিন্ন মতের বামপন্থী নেতাদের একত্র মিলনে দল গঠিত হোল—সাধারণতন্ত্রী দল। মার্কস ও এঙ্গেলস নেতা। এবারে একটা মুখপত্রের প্রয়োজন। আন্দোলন ও বিক্ষোভের সংবাদ বিক্ষুব্ধ মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। নেতৃত্বের সঙ্গে জনতার যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম চাই। এঙ্গেলসের চেষ্টায় কয়েকজন অংশীদার পাওয়া গেল। ১৮৪৮-এর ১লা জুন 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ' (Neue Rheinische Zeitung)-এর প্রথম প্রকাশ। মার্কস প্রধান সম্পাদক। সহকারী হলেন এঙ্গেলস, ড্রোন্‌কে এবং ভোল্‌ফ্‌। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে কবি ফ্রাইলিগ্রাথ (Frieligrath) ও লাসালও (Lassalle) ছিলেন।

'গণতন্ত্রের মুখপত্র' এই অভিধা নিয়ে পত্রিকা প্রকাশিত হোল। মূলধন এল র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। কিন্তু প্রথম সম্পাদকীয়তেই মার্কস তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখোস খুলে ধরলেন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মানসে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় মার্কসের মানসে তা গণতন্ত্রের পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে না। ইতোমধ্যে ভিয়েনায়, বার্লিনে, এমনকি প্যারিসেও তথাকথিত গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে চলেছে। বার্লিনে বিক্ষোভের পর যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হোল জার্মান সম্রাটের সঙ্গে হাত মেলাতে তার দ্বিধা ছিল না। জার্মান বিপ্লবে মুখ্য অংশ ছিল সাধারণ মানুষের, শ্রমিক-জনতার, কিন্তু ক্ষমতা দখলে এল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। আগে ছিল সামন্ততন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য, এখন সেখানে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে বুর্জোয়া গোষ্ঠীও শাসনযন্ত্রে অংশ পেল মাত্র। বিপ্লবের সমগ্র উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেল।

'সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা আইনের প্রচলন হতে পারবে না'—শাসনতক্তে বসে এমন ধারার এক সিদ্ধান্তে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের নির্লজ্জ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। ঠিক এই ধরনের ঘটনার সম্ভাব্যতা মার্কস আগেভাগেই ধরতে পেরেছিলেন। ধ্বসে-পড়া সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে চুক্তি না করে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার সুবিধা ছিল না। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণে মার্কসের ভুল হয়নি। 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ'-এর এক সংখ্যায় মার্কসের ভবিষ্যৎ কথন উল্লেখযোগ্য :

"In this ambiguous and contradictory task it sees itself in

its aim, the founding of bourgeois dominance, outwitted at every turn by the reaction in the absolutist and feudal interests—and it will be the loser. The bourgeoisie cannot establish its own dominance without winning the whole people as its temporary ally and without taking up a more or less democratic attitude." (John Lewis : The Life and Teaching of Karl Marx, 1965.)

ঘটনার গতি শেষ পর্যন্ত মার্কসের বিশ্লেষণ সত্য প্রমাণিত করে। জনতার সমগ্র অংশের সঙ্গে সাময়িক চুক্তিতে লাভবান হয়ে জনতার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে জার্মান পুঁজিবাদ আসলে ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি করলো। মার্কস বললেন, ১৮৪৮-এর জার্মান বিপ্লব ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের প্যারডি।

প্যারিস থেকেও দুঃসংবাদ এল। '৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যারা শুরু করেছিল তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের নতুন নির্বাচিত সরকার হাতিয়ার নিয়েছে। গণবিক্ষোভের চাপে নির্বাচিত সরকার জেনারেল ক্যাভাইনাকের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়েছে। অজস্র রক্ত ঝরিয়ে জেনারেল জনতার প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দিলেন। 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকায় মার্কস লিখলেন :

"The last official remains of the February Revolution, the Executive Commission has disappeared like a hazy phantom before the seriousness of events, Lamartine's Roman candles have transfomed themselves into Cavainac's war rockets. The 'fraternite' which the exploiting class proclaimed in February on the forehead of Paris with gigantic letters, on every prison, on every barracks, its true unsophisticated, prosaic expression is the civil war, civil war in its most frightful shape, the war between labour and capital.....The 'fraternite' lasted just as long as the interests of the middle class fraternized with those of proletariat." (John Spargo—Karl Marx. New York, 1910.)

সেদিন জার্মানীতে 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকাই একমাত্র সংবাদপত্র যার পাতায় রক্তস্নাত ফরাসী জনতার পক্ষে অগ্নিক্ষরা লেখনী উচ্চারিত হয়েছিল। দেখা গেল পত্রিকার অংশীদারদের অনেকেই মার্কসের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে উদ্যোগী। কোলোনে যাঁদের নিয়ে মার্কস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়েছিলেন তাঁদের অনেকেই মার্কসকে ছেড়ে গেলেন। তবু 'নয়ে রাইনিশে' এক নতুন ঐতিহ্য গড়ে তোলে। শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ রাজনীতির আলোয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনার বিচার একমাত্র মার্কসের সম্পাদনায় শুরু হয়। ষ্টিফান বর্ন (Stephan Born) সম্পাদিত আর একটি পত্রিকাও শ্রমিকদের জন্য কোলোনে প্রকাশিত হোত। নাম 'কোলনিশে ৎসাইটুঙ'। তার পাতায় কিন্তু রাজনীতি স্থান পায়নি—শ্রমজীবী শ্রেণীর আর্থিক চাহিদার সংবাদ ছিল তার উপজীব্য। আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত পত্রিকার প্রথম নমুনা 'বর্ন'-এর পত্রিকা। যেহেতু মার্কসীয় উপলব্ধিতে আর্থিক সংগ্রামেই শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক চাহিদা ফুরিয়ে যায় না—মার্কসের পত্রিকা অতএব চাহিদামত সংবাদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। মার্কসের পত্রিকা শ্রমিককুলের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক হাতিয়ার—নেতৃত্বের সঙ্গে নিপীড়িত ও সংগ্রামশীল মানুষের যোগাযোগের আদর্শ মাধ্যম। পরবর্তী কালে এই পত্রিকার প্রসঙ্গেই লেনিন বলেছিলেনঃ "আজ পর্যন্ত এই পত্রিকাই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় সংবাদপত্র।"[১] দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকা জার্মান সরকার ও বুর্জোয়া গোষ্ঠীর স্বার্থদুষ্ট রাজনীতি ও জনবিরোধিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে চললো। 'নয়ে রাইনিশে'র ক্লান্তিহীন নিরঙ্কুশ সমালোচনার চাবুকে শাসকগোষ্ঠী উত্যক্ত হয়েই ছিল। স্বভাবতই এর পরে আর বেশিদিন পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি।

ইতোমধ্যে কোলোনের আকাশে ঝঞ্ঝার মেঘ। মার্কস ফিরে এলেন। জরুরি মার্শাল আইন প্রযুক্ত হোল কোলোনে। কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হোল 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকার উপর। কোলোনের গণ-আন্দোলন যেমন ঘা খেল তেমনি ক্ষতি হোল ওই মুখপত্রেরও। মার্কসের সহকারী বন্ধুরা সরকারী চাপে কোলোন ত্যাগ করেছেন। ড্রোন্‌কে নেই, এঙ্গেলস নেই, ভোল্‌ফ্‌ নেই—উপরন্তু পত্রিকার প্রথম যুগের উৎসাহী অংশীদারেরা সহযোগিতার হাত গুটিয়ে

১ Collected Works, Vol. XVIII

নিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরেও ১২ই অক্টোবর, ১৮৪৮ পত্রিকা কোনোক্রমে প্রকাশিত হোল। মার্কস তখন নিঃসম্বল। পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল বর্ধিত গ্রাহক সংখ্যার কল্যাণে। পিতৃদত্ত সম্পদের অবশিষ্ট সামান্য অংশটুকুও নতুন করে মুখপত্র পরিচালনায় মার্কস খরচ করে ফেললেন। গণ-আন্দোলনের স্বার্থে মার্কস জীবনের সর্বস্বই অর্পণ করে রেখেছেন।

ক্রমাগত সরকারী চাপে জনতার সংগ্রাম ইতোমধ্যে নতুন স্তরে উঠে এল। বিক্ষুব্ধ বার্লিনের জন্য প্রাশিয়ান সরকার নতুন সাংবিধানিক আইন প্রয়োগ করলেন। বার্লিনের সাধারণতন্ত্রী দলগুলি করবন্ধ আন্দোলনে এগিয়ে এল। 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকায় মার্কস আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। আন্দোলন রাইনল্যাণ্ডেও ছড়িয়ে পড়লো। এই করবন্ধ আন্দোলনকে সোচ্চার যুক্তি জুগিয়ে চললো 'নয়ে রাইনিশে'। ফলে রাজদ্রোহের অভিযোগে মার্কস গ্রেপ্তার (১৮৪৯ ফেব্রুয়ারি) হলেন। গ্রেপ্তার হলেন এঙ্গেলসও।

রাজদ্রোহের এমন আইন মার্কস ও এঙ্গেলস-এর উপর প্রযুক্ত হোল যে-আইন তৎকালীন প্রাশিয়ান সরকার সরকারী তক্ত দখল করার সময় সুযোগ বুঝে এড়িয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ তৎকালীন প্রাশিয়ান সরকার নিজেই উপরিউক্ত আইনের চোখে অপরাধী। জনবিক্ষোভের সুযোগে ওই সরকার একদা রাজ-তক্ত অধিকার করে। সেক্ষেত্রে ঘটনাচক্রেই রাজদ্রোহমূলক তৎকালীন প্রচলিত আইনের ব্যত্যয় ঘটে। প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী নতুন সরকার ওই একই আইন অন্যের উপর প্রযুক্ত করে কোন্ যুক্তিতে?

আত্মপক্ষ সমর্থনের সময়ে মার্কসের প্রচণ্ড শক্তিশালী যুক্তিজাল বিচারালয়ের তথাকথিত নিরপেক্ষতার স্বরূপ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই বিচারকালেই এমন কতকগুলি মৌল প্রসঙ্গ মার্কস অতীব তীক্ষ্ণতার সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছিলেন যার ফলে কর্তৃপক্ষ এবং জুরী সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে কিছু করার ছিল না। তৎকালীন স্বীকৃত সংবিধানের বইটা চোখের সামনে তুলে মার্কস যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ: "কোনো আইন দিয়ে কোনো সমাজ কখনো তৈরী হয়নি। বরং সমাজ তৈরী করেছে তার আইন, নিজের স্বার্থে তার পরিবর্তন ঘটিয়েছেও। বেশ কিছুকাল সমাজের প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের কার্যকাল বহাল থাকে। তবু একদিন না একদিন তাকে পুরনো হয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন প্রকার সমাজসম্পর্কের কার্যকারিতা তৎকালীন সেই

প্রচলিত আইন দিয়ে আর মেটে না। অপ্রয়োজনীয় কাগজের স্তূপে তার স্থানলাভ ঘটে।"

মার্কস ও এঙ্গেলস সসম্মানে মুক্তি পেলেন।

তবু মার্কসের স্বদেশে অবস্থান শাসক সম্প্রদায়ের কাছে ভীতিজনক। অস্বস্তিকর। মার্কসের দুর্মর নেতৃত্ব, মার্কসের 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ', মার্কসের যুক্তিজাল ও তত্ত্ববিচার প্রাশিয়ান সরকারের কাছে বিপজ্জনক। সরকার তার আইন, রাষ্ট্রযন্ত্র, পুলিশ, কোনো কিছু দিয়েই মার্কসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারেনি। একমাত্র সুযোগ মার্কসকে জার্মানীতে স্থান না দেওয়া। সে সুযোগও তৈরী ছিল। স্বদেশে অবস্থানের নাগরিক অধিকার মার্কসের ছিল না। অতএব মার্কসকে বিতাড়িত করতে আইনটি প্রযুক্ত হতে দেরী হোল না। জার্মানী ছেড়ে মার্কসকে চলে যেতে হোল। 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল।

জার্মানীর বাইরে থেকে একের পর এক দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। গণবিক্ষোভের প্রথম ধাক্কার চোট অস্ট্রিয়ান রাজতন্ত্র সামলে নিয়েছে। উদীয়মান বুর্জোয়াদের এক অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজতন্ত্র নিজের আধিপত্য যথাযথ বজায় রাখলো। জুনের মাঝামাঝি প্রাগের গণবিক্ষোভ দমিত হোল। প্যারিসের মুখ চেয়েই দেশে বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল—সেই বিপ্লবের প্রেরণাদাত্রী প্যারিসেই শ্রমিক জনতা রক্তস্নানে নিজেদের অর্জিত অধিকার হারালো। প্যারিসে প্রতিবিপ্লবের দুঃসংবাদ ইউরোপের গণ-আন্দোলনে এনে দিল প্রচণ্ড আঘাত। য়ুরোপীয় বিপ্লবের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ এল। কোলোন থেকে মার্কস চলে গেলেন ভিয়েনায়। এঙ্গেলসও ছিলেন সঙ্গে। ভিয়েনায় তখনও জনতার প্রতিরোধ মুমূর্ষু হয়ে পড়েনি। প্রতিরোধের রক্তাক্ত পতাকা তুলে ধরে জনতার বিক্ষোভ তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে—কিন্তু সে আগুনকে সর্বব্যাপক দাবানলে পরিণত করার সাধ্য একা মার্কসের নেই—এঙ্গেলসেরও নেই। ভিয়েনায় শ্রমিক জনতার সংগঠনের অভাব। বিপ্লবকে পরিকল্পিত পথে পরিচালনক্ষম সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্ব অনেক পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার ফসল। সে ঐতিহ্য ভিয়েনায় গড়ে ওঠেনি।

মধ্য য়ুরোপের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিলেন রাশিয়ার জার।

প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর সাহায্যে ক্ষমতালুব্ধ জারের রক্তাক্ত কলুষ হাত এগিয়ে এল। সৈন্য দিয়ে, যুদ্ধের রসদ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, য়ুরোপীয় জনতার প্রতিরোধ আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করার কামনায় জারের দরাজ মন ও দরাজ হাত। অষ্ট্রিয়া নিল সেনা বাহিনীর সাহায্য—প্রাশিয়া নিল অর্থ। 'নয়ে রাইনিশে'-র পাতায় পাতায় মার্কস জারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। জারের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনে জার্মান জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে মার্কস অক্লান্ত লেখনী চালিয়ে গেলেন।

এই সময়কার একটি বিবরণ থেকে মার্কসের অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। Karl Schurz লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে গণ-আন্দোলনের নেতা কার্ল মার্কসের ছবি: "He could not have been much more than thirty years old at that time, but already was the recognised head of the advanced socialistic school. The somewhat thick-set man, with his broad forehead, his very black hair and beard and his dark sparkling eyes, at once attracted general attention. He enjoyed the reputation of having acquired great learning."[১]

[১] John Spargo: *Karl Marx*, New York, 1910

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম

রাজনৈতিক পলাতকদের শেষ আশ্রয়স্থল লণ্ডন। মার্কসকে লণ্ডনে আসতে হয়েছিল। য়ুরোপের সেই তুমুল ওঠাপড়ার যুগে স্বদেশ-বিতাড়িত অনেকেই লণ্ডনে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। ইংলণ্ডের একটা বাড়তি নামও জুটেছে 'পলাতকদের মাতৃভূমি' (Mother of Exiles)। রাইনল্যাণ্ড থেকে মার্কস প্রথমে প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে তখনও বিক্ষোভ শেষ হয়ে যায়নি। গণবিদ্রোহ দমিত হলেও তার ইতস্তত স্ফুলিঙ্গ এদিক-সেদিকে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রিন্স প্রেসিডেণ্ট লুই বোনাপার্টের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক কর্তাদের ভীষণ আঁতাত। ফলে মার্কসের প্যারিস বাস কোনোক্রমেই হবার নয়। জেনী মার্কসের ডায়েরিতে এর উল্লেখ আছেঃ "মোটে একমাস আমরা প্যারিসে ছিলাম। এখানেও আমাদের আশ্রয় জুটলো না। এক সকালে পুলিশ সার্জেণ্টের পরিচিত চেহারা দেখা গেল। তাঁর হাতে রয়েছে পরোয়ানা—কার্ল এবং তাঁর স্ত্রীকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্যারিস ত্যাগ করতে হবে। বলা হোল, আমরা ভানে (Vanne) গিয়ে থাকতে পারি। অবশ্যই এই ধরনের পলাতক জীবন আমরা চাই না। তবু জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে আমি তখনি লণ্ডনে পাড়ি দিলাম। কার্ল এল পরে।"[১]

মার্কস লণ্ডনে এলেন জুনের শেষে, ১৮৪৮। সময়টা মার্কসের খুবই দুর্দিন। আর্থিক দুরবস্থা চরম সীমায়। অর্থোপার্জনের কোনো রাস্তাই তাঁর সামনে উন্মুক্ত ছিল না। জুলাই মাসে মার্কসের চতুর্থ সন্তান লাভ হোল। পুত্র গিডো মার্কস (Guido Marx)। কিন্তু দারিদ্র্যে, দৈন্যভারে, পুষ্টির অভাবে তাকে বাঁচানো গেল না। এ সময়ে এক বন্ধুর বিবৃতি থেকে মার্কসের এক জীবনীকার তাঁর সম্পর্কে বলছেনঃ "A man who appeared to be haunted, a big, haggard, hopeless working man, who seemed to forget his misery only in the intensity of his struggle within the ranks of the Communists."

---

১ John Spargo

মার্কসের যথার্থ বর্ণনা। নিঃসম্বল, প্রায় অসহায় এই মানুষটির ভিন্ন রূপ আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ পরিবেশে চোখে পড়ার মত। সেখানে মার্কস একাকী বা নিঃসহায় নন। নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্নে উদ্দীপ্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হাজার হাজার মানুষের নেতা কার্ল মার্কস।

ফ্রাউ মার্কস (জেনী) তাঁদের পারিবারিক বন্ধু ভিডেমেয়েরকে (Weydemeyer) এক পত্রে জানাচ্ছেন : "যেটা আমায় সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে, আমার মন ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে, তা হোল আমার স্বামী এই চরম দুঃখের দিনেও নানান তুচ্ছ ব্যাপারে মনোকষ্টে রয়েছে। সামান্য সাহায্যটুকুও সে পাচ্ছে না, অথচ কত জন তার কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। সে-ই এখন নিঃসহায়! দোহাই! মিঃ ভিডেমেয়ের, ভাববেন না যেন আমরা কারুর কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করছি···।"[১]

চিঠির এই কয়েকটা ছত্রেই মার্কস পরিবারের মানসিক ও পারিবারিক ভারসাম্যহীনতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এমনও দিন গেছে যে সব দিনে কেবল দু'বেলা অন্ন সংস্থানের জন্যেই মার্কসকে তাঁর বিয়ের যৌতুকপ্রাপ্ত গৃহস্থালীর মূল্যবান্ বাসনপত্র বিক্রি করতে হয়েছে। এর মধ্যেই মার্কস 'নয়ে রাইনিশে রিভ্যু' সম্পাদনা করে গেছেন। এর আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করেছেন। পত্রিকা থেকে আয় কিছুই ছিল না। তবু পত্রিকা প্রকাশে ছিল দুর্মর আদর্শবাদের তাড়না। '৪৮-এর শ্রমিক বিপ্লবের ব্যর্থতার বিশ্লেষণ, নতুন বিপ্লবের সম্ভাবনা, চরম সাংসারিক পীড়নের মধ্যে থেকেও মার্কস প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধা করে গেছেন। '৪৮-এর পরাজিত বিপ্লবের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতা যেমন বিপ্লবচেষ্টার ইতিহাসে যবনিকা টেনে দিতে পারেনি, শোষিত মানুষের দুর্মর আশাবাদের জীবন্ত প্রতীক কার্ল মার্কসও সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতায় মৃতপ্রায় আন্দোলনের বিভীষিকা থেকে পলাতক হতে পারেননি।

প্রকাশ্য শ্রমিক আন্দোলন সেদিন সম্ভব ছিল না কোনোখানেই। ব্যর্থ বিপ্লবের চোট খেয়ে বার্লিনে, ভিয়েনায়, প্যারিসে গুপ্ত আন্দোলনের জন্ম হোল। অনেক ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের মূলতত্ত্ব সন্ত্রাসবাদে—'অ্যাডভেঞ্চারিজমে'। সেই পুরনো তত্ত্ব, যা ১৮৪৮-এর গোড়ার দিকে মার্কসের বিরোধিতায় প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'সাম্যবাদী ইশতাহারের' ঘোষণা মতই প্রকাশ্য গণবিপ্লবের

১ John Spargo

উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গে দেশে দেশে গণজাগরণের বিপুল উৎসাহ দেখা গেল। বিপ্লবের শীর্ষ থেকে পলাতক উদীয়মান বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতায় সামগ্রিক গণবিপ্লবের ছন্নছাড়া দশায় অতি-বামপন্থা জন্ম নিতে বাধ্য।

বিপ্লব অন্তে নতুন শাসকশ্রেণী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণমুখী। শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের সব কটা হাতিয়ার তখন হস্তচ্যুত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, বক্তব্যের স্বাধীনতা নেই, সভা-সমিতির অধিকার নেই। ফলে অবশ্যম্ভাবী যা, তা হোল গুপ্ত আন্দোলন। ব্যর্থ বিপ্লবের চোট খেয়ে বার্লিনে, ভিয়েনায়, প্যারিসে গুপ্ত আন্দোলনের জন্ম হোল। এ আন্দোলনের পরিণতি সন্ত্রাসবাদে। দিনের আলোয় গণ-আন্দোলন যখন সম্ভব হয় না, সন্ত্রাসবাদ তখন এক অস্বাভাবিক পরিণতি। উন্মুক্ত গণবিক্ষোভের পথ থেকে সরে এসে সাম্যবাদী আন্দোলন গুপ্ত সুড়ঙ্গের বাঁকাচোরা পথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হোল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু অন্ধকারের জীব সংগ্রামী মানুষের ঝাঁকের মধ্যে মিশে যায়—আশ্রয় নেয় কিছু গুপ্তচর, গণ-আন্দোলনের শত্রু, অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী হঠাৎ নেতা।

মার্কস ও এঙ্গেলস সভয়ে দেখলেন তাঁদেরই নেতৃত্বে সাম্যবাদী আন্দোলন যতখানি এগিয়ে গিয়েছিল, গুপ্ত আন্দোলনের অন্ধকারে তার পরিসমাপ্তি হতে চলেছে। চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের হঠাৎ-নায়কেরা রাতারাতি জঙ্গীবাদে আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করতে চলেছে। বিধ্বস্ত সাম্যবাদী আন্দোলনের এই মুহূর্তে কার্যক্রমের বদল প্রয়োজন। কিন্তু তা কি সন্ত্রাসবাদে ? সমাজবিপ্লবের তাত্বিক উপলব্ধির অসম্পূর্ণতা থেকে গেলে বিপ্লবের ধ্বংস অনিবার্য। এক পক্ষ যখন তুমুল জঙ্গীবাদে আন্দোলন নিমজ্জিত করার পক্ষপাতী, মার্কস তখন নতুন করে গোড়া বেঁধে বৈপ্লবিক সংগঠনের তত্বগত ভিত্তিকে দৃঢ় করার প্রয়োজন বোধ করলেন।

কমিউনিস্ট লীগের সেণ্ট্রাল কমিটীতে (মার্চ ১৮৫০) মার্কস ও এঙ্গেলস মিলিতভাবে এক কার্যক্রমের খসড়া রাখলেন (Address of Central Committee to the Communist League)। এই প্রথম মার্কসের প্রেরণায় তত্বগত ভিত্তির উপর সর্বহারা শ্রমিকের শ্রেণীগত সংগঠনের বীজ উপ্ত হোল। এতকাল কমিউনিস্ট লীগের কোনো গণভিত্তি ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে দেশবিদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা লীগের ছত্রছায়ায় মিলিত

হতেন। কিন্তু সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বলতে যা বোঝায় কমিউনিস্ট লীগকে তা বলা যেত না। '৪৮-এর বিপ্লবের পর য়ুরোপীয় বুর্জোয়াগোষ্ঠীর হাতে যখন নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতা এসে গেল, দেখা গেল ক্ষমতার বাইরে নিপীড়নের উপাদান হিসেবে কোটি কোটি মানুষ রয়ে গেছে জীবিকাগত শ্রেণীবিন্যাসে যারা কলকারখানার মজুর, ক্ষুদ্র ও মধ্যস্বত্বভোগী কৃষক—শহরের জীবিকান্বেষী মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী 'পেটি-বুর্জোয়া'। '৪৮-এর বিপ্লবের সৈনিক হিসেবে ফ্রান্সে, জার্মানীতে, অষ্ট্রিয়ায় উদীয়মান বুর্জোয়া শক্তির সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে যারা সামন্ততন্ত্রের একচেটিয়া রাজ্যপাট ধ্বংস করেছে।

অবশ্য '৪৮-এর বিপ্লবের আগে ধনতন্ত্রের ক্রমপ্রসারের কারণে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস নতুন করে বিভিন্ন পর্যায়ে দানা বেঁধে উঠছিল। '৪৮-এর য়ুরোপীয় বিপ্লব হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো স্থানীয় অসম্পূর্ণ গণবিক্ষোভ নয়। সমস্ত য়ুরোপ জুড়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভের সংগত আর্থিক কারণ ছিল। ১৮৪৫ থেকে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে উদীয়মান ধনতন্ত্রে আর্থিক সংকট দেখা দিতে থাকে—যার ব্যাখ্যা 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' পুস্তকে মার্কস বিবৃত করেছেন। এই সংকটের কারণেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকা অসন্তুষ্ট বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে সর্বহারা মজুর-চাষী-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লড়াইয়ের ক্ষেত্র একত্র সামিল হতে পেরেছিল। 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' পুস্তকেই মার্কস সমাজবিকাশের বিশেষ পরিণতি থেকে বুর্জোয়া বিপ্লবের আসল তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস মিলিতভাবে কমিউনিস্ট লীগে যে কার্যক্রম রাখলেন তা হোল বুর্জোয়া গোষ্ঠীর রাজ্যপাট দখলের পর শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম। মার্কসের বক্তব্যে মোটামুটি পাঁচটি মূলনীতি স্থান পেয়েছে :

১ শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন গণসংগঠন তৈরী করা
২ সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ
৩ নতুন বুর্জোয়া সরকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা
৪ শ্রমিক শ্রেণীর দাবী-দাওয়াগুলি তুলে ধরা
৫ সংগ্রামের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত করা

বুর্জোয়া গোষ্ঠী কর্তৃক রাজ্যপাট অধিকার করার পর সমাজবিপ্লব সম্পূর্ণ করতে জঙ্গী শ্রমিক সংগঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুভূত হোল। লক্ষ্য— নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে আসা। উনিশ শতকের মধ্যকালে কলকারখানা ও শিল্পের প্রসারে সমাজবিকাশের লক্ষণীয় স্তর হোল বিত্তহীন বর্ধিষ্ণু শ্রমিক শ্রেণী। এতদিন সমাজবিপ্লবে নিপীড়িত অন্যান্য শ্রেণীর সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর যে দায়িত্ব ছিল '৪৮-এর গণবিপ্লবে বুর্জোয়া অধিকারে রাষ্ট্রক্ষমতা আসার পর সে দায়িত্বের বদল ঘটেছে। কেননা আগামী সমাজবিপ্লবের সংগঠন ও নেতৃত্বের শীর্ষে বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে আর পাওয়া যাবে না। আগামী বিপ্লবের সংগ্রাম বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই— লুণ্ঠনকারী আক্রমণমুখী ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে। মার্কস পরিষ্কার ভাষায় বললেন : "শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গণতন্ত্রী পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে, কিন্তু শ্রমিক স্বার্থে আঘাত লাগলেই গণতন্ত্রী মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধেও হাতিয়ার তুলে ধরতে হবে।"

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পরিস্থিতিতে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজবিপ্লব সার্থক করে তোলার নতুন কার্যক্রম নিলেন। কিন্তু '৪৮-এর বিপ্লবের পর প্রাপ্য সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত শ্রমিক নেতৃত্বের একাংশে তখন হতাশার অচলায়তন গড়ে উঠেছে। উন্মুক্ত গণবিক্ষোভ থেকে সরে আসা সাম্যবাদী আন্দোলন গুপ্ত আন্দোলনের সড়কে পা বাড়াতে উদ্যত।

মার্কসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তিনজন নেতাকে দেখা গেল। কার্ল শেপার (Karl Schapper), আগস্ট ফন উইলিচ্ (August Von Willich), প্রফেসর কিঙ্কেল (Prof. Kinkel)। সাম্যবাদী আন্দোলনে এঁরা তখনই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পক্ষে উচ্চরব—কোনো দৃঢ়মূল গণসংগঠনের তোয়াক্কা না রেখেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এঁদের কাছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হঠকারী জঙ্গীবাদীকে নিয়ে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ শুরু করা। মার্কসের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী আন্দোলনে এঁরা তুমুল শোরগোল তুললেন। এঁদের বিশ্লেষণে ও তত্ত্ববিচারে মার্কসের নতুন খেতাব লাভ হোল। সাম্যবাদী ইশতাহারের রচয়িতা মার্কসকে বলা হোল "বিশ্বাসঘাতক", "প্রতিক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ"। এমনকি

এক সময়ে দেখা গেল কমিউনিস্ট লীগে মার্কসের সমর্থক সংখ্যা কম। উইলিচ্, কিঙ্কেলের দিকেই পাল্লা ভারী। সেণ্ট্রাল কমিটীতে বিপ্লব-দর্শন সম্পর্কে মার্কস তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য রাখলেন। হঠাৎ বিপ্লবের রোমাণ্টিক মোহের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সতর্কবাণী, যা আজও গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

"The majority has substituted the dogmatic spirit for the critical, the idealistic interpretation of events for the materialistic simple willpower, instead of the true relations of things, has become the motive force of revolution. While we say to the working people : 'you will have to go through fifteen, twenty, fifty years of civil wars, and wars between nations, not only to change existing conditions but to change yourselves and make yourselves worthy of political power. You, on the contrary, say, we ought to get power at once, or else give up that fight...Just as the democrats made a sort of fetish of the words—the people, so you make one of the word 'proletariat'. Like them you substitute revolutionary phases for revolutionry evolution."

(Quoted by Jaures : *Studies in Socialism*, p. 44)

মার্কসের এই তাত্ত্বিক প্রকল্প হঠাৎ-বিপ্লবের নায়কেরা কী ভাবে নিতে পারে ? মার্কস বলেছেন, দশ, পনের বছর কেন, শ্রমিক শ্রেণীর পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের শুধুমাত্র যোগ্যতা অর্জন করতেই। সুদীর্ঘ সংগ্রাম, নির্যাতন, আর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগের সীমান্ত পেরিয়ে সত্যকার সমাজবিপ্লব দেখা দেয়। গুপ্ত আন্দোলন বা চক্রান্তের মহিমায় সামাজিক কাঠামো বদলের হাস্যকর চিন্তার বিরুদ্ধে মার্কস শাণিত বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। একদিনের বিতর্ক শেষে উইলিচ মার্কসকে সহ্য করতে না পেরে সোজাসুজি তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন—যেন ওই দ্বন্দ্বের জয়-পরাজয়ে সমাজ-বিপ্লবের গতিপথ নির্ণীত হয়ে যাবে। অবশ্যই মার্কস এ ধরনের হাস্যকর

প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না—ফলে, মার্কস অনুচিতভাবে ‘কাপুরুষ’ আখ্যা পেলেন। কিন্তু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন কনরাড শ্র্যাম (Conrad Schramm), মার্কসের বিশ্বস্ত অনুজ-সহযোগী শিষ্য। উইলিচের আহ্বান নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তরুণ শ্র্যাম যৌবনের উত্তেজনায় সেদিন কারুর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। সেপ্টেম্বরের এক সকালে উইলিচের পিস্তলের গুলিতে শ্র্যাম মাথায় আঘাত পেয়ে ক্ষণকালের জন্য জ্ঞান হারালেন। লড়াইতে উইলিচ জিতলেন বটে কিন্তু কমিউনিস্ট লীগের পরবর্তী সভায় মার্কস ভোটের জোরে লীগের প্রধান কার্যালয় কোলোনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন—কিংকেল, উইলিচ, শেপারের প্রভাব অতদূরে গিয়ে পৌঁছুবে না।

জঙ্গীবাদী অ্যাডভেঞ্চারিস্টদের কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে শ্রমিক সঙ্ঘকে মার্কস নিজের আওতার বাইরে রাখলেন। এমনকি নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে মার্কসের সম্পাদনায় ‘নয়ে রাইনিশে রিভ্যু’ প্রকাশিত হচ্ছিল—তাও ছ’টা সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেল। দৈনন্দিন গণ-আন্দোলন থেকে এভাবে মার্কস অনেক দূরে সরে গেলেন। মার্কসের জীবনে ছায়ার অন্ধকার তখনও বিস্তৃত। এঙ্গেলসকে মার্কস লিখছেন (১৮৫১): “সমাজ থেকে যে বিচ্ছিন্নতা আমরা দুজনে এখন ভোগ করছি তা আমার অপছন্দ নয়। অবশ্যই আমাদের যা আদর্শ আর দৃষ্টিভঙ্গি এটা তারই ফল।”

এঙ্গেলস জবাবে লিখলেন : “From now on we are responsible to ourselves alone...The violent events of a revolution leave a disturbing heritage in the minds of those who take part in it and in particular in the minds of those who are hounded into exile away from their homes. This mental disturbance affects even capable men and makes them irresponsible. The result is that they indulge in conspiracies and romantic revolutions which compromise both them and the cause they have at heart...storms always raise a certain amount of dirt, and a revolutionary period does not smell of attar of roses. It is clear that occasionally one is bespattered with all sorts of muck”. (Lewis, p. 129)

সমাজ বিকাশের তত্ত্ব যাদের চেতনায় নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে পরিবেশের প্রতিকূলতা তাদের হৃদয়মন হয়তো কিছুকালের জন্য অবশ করে দিতে পারে। কিন্তু সমাজ বিবর্তন থেকে সমাজ বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি পর্যন্ত তাদের আমৃত্যু প্রতীক্ষা জীবনকে স্থির প্রত্যয়ে উজ্জ্বল রাখবে। গণবিক্ষোভের পরিণতি যা বুর্জোয়া বিকাশের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে দিল অথচ নির্বিত্ত শ্রমিক চাষী ও মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটালো তার ফলশ্রুতি নিঃসন্দেহে বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। সমাজের নতুনতর আর্থিক বিকাশ ও তজ্জনিত কারণে সামজিক শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিবর্তমান রূপ মার্কস তাঁর সেই চরম মানসিক ও পারিবারিক দুর্দশার মুহূর্তেই তুলে ধরতে পেরেছিলেন। এই সময়েই মার্কস লিখেছিলেন 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম'।

সমকালীন ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও ইতিহাসের গতিশীলতার অর্থনৈতিক কারণের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ১৮৪৮-এর তুমুল গণবিক্ষোভের পেছনে য়ুরোপ জুড়ে দুটি আর্থিক সংকটের প্রভাব সক্রিয় ছিল। '৪৫ ও '৪৬-এর ফ্রান্সে খাদ্য উৎপাদনে সংকট, ফলে '৪৭ সালে সাধারণের পক্ষে দুর্বিষহ ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা '৪৮ সালে রক্তঝরা গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ল। একই সময়ে গ্রেট বৃটেনে '৪৭ সালে গ্রীষ্মের পর বিভিন্ন শিল্পে ও ব্যবসায়ে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্য সংকটের ধাক্কায় ইংলণ্ডে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দেনার দায়ে ছোটবড় একাধিক ব্যাঙ্ক কাজ-কারবার গুটিয়ে নেয়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কৃষি ও শিল্পের সংকট প্রায় সমস্ত য়ুরোপ জুড়েই শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্তের জীবন অপ্রত্যাশিত দুরবস্থার গহ্বরে টেনে আনে। '৪৮ সালের য়ুরোপ জুড়ে গণবিক্ষোভের মূল কারণ সমাজের অর্থনৈতিক অসংগতির মধ্যেই নিহিত ছিল। সময়োচিত পরিবেশে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের স্বরূপ ও তজ্জনিত শ্রেণী-সংঘর্ষের চরিত্র মার্কসের এই রচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সমাজের বিশেষ অবস্থায় শিল্প-শ্রমিক ও শিল্প-মালিক শ্রেণীর আবির্ভাব— ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের আগে যাদের আবির্ভাব সম্ভব হয়নি। শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তিত পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্ক—যথা, শিল্প-মালিকের সঙ্গে পুঁজির মালিকের (Finance Aristocracy), শ্রমিকের সঙ্গে শিল্প-মালিকের,

শ্রমিকের সঙ্গে কৃষকের, শহুরে ছোট ছোট ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে শিল্প-মালিক এবং শ্রমিকের শ্রেণী সম্পর্ক ইত্যাকার জটিল শ্রেণী বিন্যাসের স্বরূপ '৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের সক্রিয়তার মধ্যে মার্কসের সন্ধানী চোখ খুঁজে খুঁজে বার করেছে।

বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী প্যারিসের পথে পথে সংগ্রাম করেছে। সম্রাট লুই ফিলিপের সমর্থকগোষ্ঠী ধনতন্ত্রের প্রসার বিরোধী বড় বড় বণিক্, পুঁজির মালিক ও ব্যাঙ্কার গোষ্ঠীর রাজ্যপাট '৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ধাক্কায় চূর্ণ হোল। নতুন যে সরকার তৈরী হোল তার সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আর শ্রমিক রাজনীতির সক্রিয়তা বেশিদিন টেঁকেনি। কেননা সে সরকার উদীয়মান বুর্জোয়া গোষ্ঠীর। টেঁকেনি তার যথাযথ সামাজিক কারণও মার্কস দেখিয়েছেন। মার্কস দেখিয়েছেন, এই গণবিক্ষোভের কোনো স্তরেই শ্রমিকের নেতৃত্ব ছিল না। সম্ভবও ছিল না, কারণ ধনতন্ত্রের সেই পরিমাণ বিকাশ তখনও হয়নি যখন সংখ্যাগুরু নির্বিত্ত শ্রমিক অনায়াসে গণবিক্ষোভে নেতৃত্বের আসন দখল করে নিতে পারে। ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের লাল গণতন্ত্র গড়ে তোলার স্বপ্ন হাওয়ায় মিশিয়ে যায়।

বিপ্লবের আঘাতে '৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে যে নতুন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোল সেই গণতন্ত্রের শীর্ষদেশে স্থান পেয়ে বুর্জোয়া গোষ্ঠী পূর্বের ক্ষমতাধিকারী বণিক্, পুঁজি-মালিক (merchant and finance aristocracy) ও অন্যান্য সম্পত্তিবান্ সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রক্ষমতায় সহযোগী করে নিল। অস্থায়ী সরকার গঠন হওয়ার কয়েকদিন বাদে শ্রমিক বিক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে শুরু করে। প্রশ্ন দেখা দেয়, সরকার পরিচালনায় শ্রমিক প্রতিনিধি কই? শ্রমিক শ্রেণীর দাবি প্যারিসের পথে পথে মিছিলের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। ফলে, শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) ফরাসী রিপাবলিকে স্থান পেলেন। চতুর্দিকে বিরোধী শ্রেণী সমাবেশের মধ্যে এই স্থান লাভে শ্রমিক স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হতে পারে? মার্কস বলেছেন, ফরাসী শ্রমিক আর এক পাও অগ্রসর হতে পারে না, এমনকি বুর্জোয়া সমাজের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না, যতদিন দেশের গণশক্তি কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা সর্বহারা শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের মাঝখানে থাকবে। কেবলমাত্র

বিপ্লবের আকর্ষণে, বুর্জোয়া সমাজবদলের চাহিদায় নয়—পুঁজির শাসন পরিবর্তনের দাবিতে নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীকে সামনে রেখে ওরা সংগ্রামে নামতে পারে। এটা ঘটতে পারে জুনের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই।"

২৪শে জুনের ঘটনা ফ্রান্সে গণবিপ্লবের পক্ষে অতীব শোকাবহ। ২৪শে জুন ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের চেহারাই পাল্টে দিল। '৩৮-এর বিপ্লবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া। মে মাসে গণভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন সভায় এলেন। আইন সভায় রাষ্ট্রপরিচালনায় পাঁচজন সদস্য নিয়ে কমিটী তৈরী হোল। পাঁচ জনের কমিটীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো নেতাই স্থান পেলেন না। শ্রমিক অসন্তোষের শুরু এখান থেকেই।

২৪শে জুন থেকে চারদিন প্যারিস শহর গণবিক্ষোভের উত্তুঙ্গ শীর্ষে। ২৪শে জুন জেনারেল ক্যাভাইনাক শাসনভার গ্রহণ করলেন। নিরস্ত্র জনতাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে সশস্ত্র সেনাবাহিনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হোল। ২৪শে জুন থেকে তিনটে দিন প্যারিসের রাজপথ সামগ্রিক যুদ্ধের বিধ্বস্ত ভূমি রচনা করলো। ক্যাভাইনাক বিজয়ী হলেন বটে কিন্তু অপরিমেয় রক্তস্নানের পর বিক্ষুব্ধ জনতা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোল। ক্যাভাইনাক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। সমস্ত রাজনৈতিক সঙ্ঘ, সভা-সমিতি পুলিশের দখলে এল। সমাজতন্ত্র প্রচারের ছাপাখানা ও প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হোল। বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক নেতারা ক্যাভাইনাকের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

গণ-আন্দোলনের চরম দুর্দশার মুহূর্তে সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। সেপ্টেম্বরের এক উপনির্বাচনে লুই বোনাপার্ট ফরাসী শাসন পরিষদে স্থান করে নিলেন। পুরো নাম—চার্লস লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। হল্যাণ্ডের রাজার পৌত্র চার্লস বোনাপার্ট। এঁরই পিতামহী দ্বিতীয় বিবাহে নেপোলিয়ন-সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন। রক্তের দিক থেকে নয় সামাজিক সম্পর্কে চার্লস লুই বোনাপার্ট প্রথম নেপোলিয়নের পৌত্র। তাঁর দেহে জোসেফাইনের রক্তধারা। প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা যখন ফ্রান্সের শাসন পরিষদে আসর জমিয়ে রাখে, বোনাপার্ট ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব সদস্যদের মধ্যে বিস্তৃত করে নেন। নভেম্বরে নতুন সংবিধান গৃহীত হোল। সংবিধানে বলা হোল, ৭৫০ জন সদস্য নিয়ে শাসন পরিষদ "চেম্বার" গঠিত হবে। চেম্বারের

শিরোমণি সর্বময় কর্তৃত্বর অধিকারী প্রশাসক হবেন একজন প্রেসিডেন্ট। চেম্বারের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন লুই বোনাপার্ট ১৮৪৮-এর ডিসেম্বরে।

১০ই ডিসেম্বর নির্বাচনের দিনে ফ্রান্সে দেখা গেল প্রতিক্রিয়াপন্থী এক কৃষক জাগরণ। ড্রাম বাজিয়ে, শোভাযাত্রা সহকারে প্রায় প্রতিটি পোলিং বুথে তাদের অভিযান—মুখে শ্লোগান, 'ধনীরা নিপাত যাক', 'গণতন্ত্র নিপাত যাক', 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন'। লুই বোনাপার্ট তখনও নির্বাচিত হননি। ফ্রান্সে সম্রাটও কেউ নেই। তবু বোনাপার্টের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের যে স্বার্থসিদ্ধির আশা, তাতে ইন্ধনের মত ব্যবহৃত হোল ফ্রান্সের কৃষক সমাজ। ঠিক এইদিন থেকে চার বছর বাদে প্রেসিডেন্ট বোনাপার্ট সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রূপে ফ্রান্সে নতুন করে রাজ সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা দিলেন। ১৮৪৮-র ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতন্ত্রী সরকার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘর্ষে চূর্ণ হয়ে পরিণামে রাজতন্ত্রী সরকারে রূপায়িত হোল। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পিছনে অপরিণামদর্শী কৃষককুলের ভূমিকাই ছিল সক্রিয়। ক্যাভাইনাকের শাসন এড়াতে গিয়ে ফ্রান্সের পেটি-বুর্জোয়া সম্প্রদায় কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ সিংহাসনের শাসন আহ্বান করে আনলো। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘর্ষে ঘটনাবহুল ফ্রান্সের এই সময়কার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ মার্কস তাঁর দ্বিতীয় এক গ্রন্থেও বিবৃত করেছেন—'দি এইটিন্থ্ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট'। 'ফান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' পুস্তকের সঙ্গেই তা পঠিতব্য।

'৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব ও পরবর্তী কালের ঘটনাপ্রবাহের সামগ্রিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা 'এইটিন্থ ব্রুমেয়ার'-এ বিবৃত। মার্কসীয় দর্শনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ইতিহাস বিচারের বিশিষ্ট নিদর্শন এই রচনা। ১৮৩০-এ বিক্ষুব্ধ পারী শ্রমিকের আঘাতে ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজত্বের অবসান। ৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে লুই ফিলিপের রাজত্বের পতন। ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হলেন লুই ফিলিপ। ফিলিপের সহায় ফ্রান্সের উদীয়মান বুর্জোয়া গোষ্ঠী। লুই ফিলিপকে মার্কসীয় পরিভাষায় বলা হয় বুর্জোয়া সম্রাট। ইতোমধ্যে বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে সাঁ সিমঁ ও ফুরিয়ের-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সঙ্ঘ গড়ে উঠলো। ব্লাঙ্কি এবং আরো কয়েকজনের প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘও গড়ে

ওঠে। এই সব সঙ্ঘ-সমিতি মারফৎ পারী নগরীর জনপথে বিক্ষোভ সংঘটিত হতে থাকে। ১৮৪৭-এ ফ্রান্সের শিল্পে সংকট শুরু। এই সংকটই যে '৪৮-এর ফেব্রুয়ারির গণবিক্ষোভের মূল কারণ মার্কস তা দেখিয়েছেন। পরবর্তী কালের ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ইতিহাস নানাভাবে মার্কসের এই বিশ্লেষণ অভ্রান্ত বলেই মেনে নিয়েছে।[১]

'এইটিন্‌থ ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মর্মার্থঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি গণতন্ত্র ঘোষিত হোল। সাধারণ মানুষের সরকার নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হোল। লুই ফিলিপের রাজত্বকাল ছিল অভিজাত পুঁজিতন্ত্রের (ব্যাঙ্কার ও ফিনান্সিয়ার) একচেটিয়া আধিপত্যের কাল। অসন্তুষ্ট শ্রমিক বিক্ষোভে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতা হাতে এল উদীয়মান বুর্জোয়াদের। নবীন ধনতন্ত্রবাদের বাহক যারা, ক্ষমতার শীর্ষে বসে কয়েক মাসের মধ্যেই তারা ফ্রান্সের রাজনীতিতে শ্রমিকপ্রাধান্যের উচ্ছেদ ঘটালো। ২৪শে জুন ফ্রান্সের শাসক বদল হয়ে যায়—অজস্র শ্রমিকের রক্ত ঝরিয়ে ক্যাভাইনাকের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বছর বাদে জুনে গণতন্ত্রী সংবাদপত্র সমূহের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হোল। সাধারণের রাজনৈতিক সমিতি গড়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হোল—ফলত গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রসারের পথ রুদ্ধ হোল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদীয়মান বুর্জোয়াদের ক্ষমতাও অটুট রইলো না। ১৮৪৮-এর ডিসেম্বরে লুই বোনাপার্ট নতুন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে ১৮৫২-র ডিসেম্বরে ফ্রান্সে নতুন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিতন্ত্রের শাসন কায়েম করেন। বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ফ্রান্সের রাজনীতিতে

---

১ R. Cameron লিখিত *France and the Development of Europe* পুস্তকে লেখক পরিষ্কার বলেছেন: "Crisis of 1848 was first and foremost a financial and banking crisis." Charls P. Kindleberger : *Economic Growth in France and Britain* : "The revolution has been intensively studied by French economic historians...... ...Their conclusion, as I interpret it, is that it was in large part brought on by the accident of harvest—first by the worst in fifty years in 1846 and then by the best in 1847, sending prices skyhigh to impoverish the urban dweller and then plunging them to the depths to ruin the farmer (who had not benefited from the high prices because of lack of marketable surplus."

একের পর এক যে সব ঘটনা ঘটে সেই সব ঘটনার রাজনৈতিক পশ্চাৎপটে কায়েমী স্বার্থবাদীদের কী পরিমাণ হাত ছিল 'এইটিন্‌থ ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস তা দেখিয়েছেন এবং প্রতিটি ঘটনার পিছনে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সক্রিয় প্রভাব মার্কসের বিশ্লেষণেও পরিষ্কার।

সমকালীন ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উজ্জ্বলতর নিদর্শন মার্কসের এই রচনা। ১৮৪৭ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক সংকট, তারই প্রতিফলন ফ্রান্সের বিক্ষুব্ধ রাজনীতিতে আর বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে। এই শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে আঠারো ও উনিশ শতকে বুর্জোয়া বিপ্লব ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের চেহারা মার্কস পরিষ্কার তুলে ধরেছেন। বুর্জোয়া বিপ্লবের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং অসফল নেতৃত্ব জনিত প্রলেতারীয় বিপ্লবের বারংবার পরাজয়—এই সব ঘটনা আঠারো ও উনিশ শতকের ফ্রান্সের আর্থিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া। সেই একই প্রতিক্রিয়ায় কৃষক অভ্যুত্থানে লাভবান হলেন লুই বোনাপার্ট।

প্রথম ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯) কৃষকদের হাতে জমি এল—ফ্রান্সের কৃষি-ক্ষেত্রে ভূমিদাস প্রথার (সার্ফডম) উচ্ছেদ ঘটে। বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে নেপোলিয়নের রাজত্বে কৃষিজমিতে চাষীদের পূর্ণস্বত্ব কায়েম হয়েছিল। ছোট ছোট চাষের জমিতে চাষীরা মালিক। পূর্বের অবস্থার তুলনায় আর্থিক সমস্যার সম্ভবমত সুরাহা হোল। ছোট বড় জোতদার ও চাষীদের পূর্ণ সমর্থন পেলেন নেপোলিয়ন। কিন্তু দু' পুরুষ পার হতে না হতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন সংকটে কৃষিজীবনেও সংকট ঘনিয়ে আসে। ক্রমদারিদ্র্যে ও দেনায় কৃষক জীবনে আগের স্বাচ্ছল্য আর রইলো না। উনিশ শতকের প্রারম্ভে নেপোলিয়নীয় কৃষিতন্ত্রের যে বাড়বাড়ন্ত ছিল, বর্ধিত আয়ের যে চেহারা ছিল, ধনতন্ত্রের ক্রম-প্রসারিত নাগপাশে ওই শতকের মধ্যযামেই তার জীর্ণদশা। শহরের পুঁজি-পতিদের কাছে দেনায়, বন্ধকে আর ক্রমবর্ধিত সুদের চাপে তার শ্বাসরোধকারী অবস্থা।

এই পরিবেশে '৪৮-এর ফেব্রুয়ারি ও জুনে যে বারবার শাসক বদল হোল সেই সব পরিবর্তনের কোনোটাই ফ্রান্সের কৃষককুল সুনজরে দেখেনি। শহরে শ্রমিকদের সংগ্রাম, বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব কৃষক সমাজের কাছে শ্রেণীস্বার্থের বিরোধী বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথম 'নেপোলিয়ন দি গ্রেট'-এর শীর্ণ

ছায়ামাত্র লুই নেপোলিয়নকে তাদের পরিত্রাতা বলেই মনে হয়েছিল। শিল্প-শ্রমিক ও শিল্প-মালিকদের শ্রেণীদ্বন্দ্বের সুযোগে বৃহৎ পুঁজিতন্ত্রের সমর্থনে লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অনায়াসে ফরাসী সম্রাটের মুকুট অধিকার করে নিলেন। ১৮৪৮-এর জুন মাসে যা ঘটলো মার্কসের মতে ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের তা ক্যারিকেচার। 'এইটিন্থ্ ব্রুমেয়ারে' লুই নেপোলিয়নের ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার (২ ডিসেম্বর, ১৮৫১) পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত।

লণ্ডনে

'এইটিন্থ ব্রুমেয়ার'-এ রচিত হয়েছে ফরাসী জনতার দুর্ভাগ্যের কাহিনী, কিন্তু মার্কসের জীবনের কোন্ অধ্যায়ে তা লেখা হয়েছে—কোন্ দুর্ভাগ্যের অবসরে মার্কস এ রচনা শেষ করতে পেরেছেন? মার্কসের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দুর্দশা তখন চরমে। লণ্ডনে প্রবাসকালের প্রথম দিকেই দুটি সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে—একটি পুত্র, একটি কন্যা। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু। মৃত্যুর পর সৎকারের পয়সাও ছিল না। গৃহস্থালীর সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে সংসার চলছিল। এক এক করে দৈনন্দিন ব্যবহার্য সম্পত্তির বিনিময়ে দিন গুজরান হোত, আর সেই পথেই নিঃসম্বল পরিবারের মৃত কন্যার কফিনের সংস্থানও করতে হয়েছিল। এই কালে মার্কস পরিবারের একান্ত অনুগত পরিচারিকা হেলেন ডেমুথকে স্মরণ করতেই হয়। হেলেন ডেমুথ মার্কস পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পিতৃগৃহ থেকে ডেমুথকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন জেনী—নিজের দুটি সন্তানের জন্মের পর। এমন এক সময়ে ডেমুথ মার্কস পরিবারে এসেছিলেন যখন মার্কসের পারিবারিক দুর্দিনের শুরু। মার্কস পরিবারকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার চেষ্টায় অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা ডেমুথের উপর দিয়েও গেছে। চরমতম দুঃখের দিনে ডেমুথকেই পরিবারের ব্যবহার্য সম্পত্তি বহন করে বন্ধক দিয়ে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে।

এই পারিবারিক দুর্দশার কাহিনী মার্কস ও জেনীর অনেক চিঠিতেই ছড়িয়ে আছে। এক চিঠিতে মার্কস লিখছেন (Mehring 216) : "আমার অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে এখন আমি বাড়ির বাইরে আসতে পারি না। পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত বন্ধক দেওয়া। নিরামিষ আহার জুটছে। বন্ধকজাত অর্থও নিঃশেষ হয়ে এসেছে।"

পুত্রের মৃত্যুর পর জেনী তাঁর জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা এক চিঠির বক্তব্যে মর্মান্তিক ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। জেনীর স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে। সদ্যোজাত সন্তানের মুখে মায়ের দুধ জুটছে না। জেনী লিখছেন : "বাচ্চার জন্যে 'ওয়েট-নার্স' রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—শেষ পর্যন্ত আমার শুকনো বুকেই ওকে টেনে নিতুম—ফলে বুকে পিঠে অজস্র যন্ত্রণায় আমি

মৃতপ্রায়। দুধের বদলে আমার দেহমনের সমস্ত নিঃশব্দ বেদনাও সেই দেবশিশু (Little Angel) ভোগ করেছে। তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। সদ্যোজাত শিশু অপরিসীম বেদনায় একটা দিনের দু'ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টাও ঘুমোতে পারেনি।"[১]

বিশ্বের তাবৎ নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের চিন্তায় আর কর্মে যাঁর জীবন উৎসর্গিত এই নিদারুণ পারিবারিক দুর্ভাগ্য থেকে তাঁর মুক্তি কই? তবু সমগ্র জীবন জুড়ে অশেষ দুর্ভাগ্যের আঘাত সহ্য করতে করতে মানবকল্যাণের সার্থকতম পথের নির্দেশ মার্কস দিয়ে গেছেন।

ইংলণ্ড হয়ে উঠলো তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ। দুর্দশার মুহূর্তে ঠোঁট কামড়ে মার্কস লণ্ডনে পড়ে রইলেন। সহযোগী এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টারে চলে গেলেন পিতৃ-ব্যবসায়ে যোগ দিতে। মার্কসের সেই চরম দুর্দিনে হঠাৎ একটু আশার আলো দেখা গেল। ১৮৫১-এর বছর শেষে 'নিউইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউনে' ধারা-বাহিক লেখার আমন্ত্রণ পেলেন। ট্রিবিউনের সম্পাদক চার্লস ডানা '৪৮-এর বিপ্লবমুহূর্তে জার্মানীতে ছিলেন। মার্কসের সঙ্গে পরিচয় সেই সময় থেকেই। মার্কসের সাংবাদিকতা জার্মান পাঠকদের কত প্রিয় ছিল ডানার তা অজ্ঞাত ছিল না। ইংরেজ পাঠকদের কাছে তাঁর অনাদর হবে না জেনেই ডানা মার্কসকে তাঁর পত্রিকার নিয়মিত লেখকতালিকাভুক্ত করে নিলেন।

প্রথমে রচনা পিছু মার্কসের প্রাপ্য ছিল দশ ডলার—পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় পনেরো ডলার। ইংলণ্ডের টাকার মূল্যে মাসিক আয় চার পাউণ্ডের বেশি হোত না। তবু কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে কেটে যেত। এঙ্গেলসও ম্যাঞ্চেস্টার থেকে মাঝে মাঝে কিছু পাঠাতেন। মার্কসের পাঠানো লেখার সমস্তটাই ট্রিবিউনে সব সময়ে প্রকাশিত হোত না। লেখার উপর ডানার সম্পাদনা ছিল। মতে না মিললে কাঁচি কাটা হোত—সময়ে সময়ে রচনার সমস্তটাই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় নিত। এত অর্থাভাবের মধ্যেও বিনা অর্থমূল্যে মার্কস রচনা তৈরী করেননি এমন নয়। চার্টিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র 'পিপল্স পেপার'-এ রচনা দিয়েছেন। জার্মান পত্রিকা 'ডি প্রেসে'-এ নিয়মিত লিখেছেন। ইংরেজি পত্রিকা 'দি ডিপ্লোম্যাটিক রিভিয়্যু', 'দি ফ্রি প্রেস'

---

১ ভিডেমেয়েরকে লিখিত জেনী মার্কসের চিঠি। Spargo, p. 180

প্রভৃতিও মার্কসের রচনা পেয়েছে। 'নিউইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন'-এর সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পর কয়েক বছর মার্কসের জীবন অস্বাভাবিক শান্ত পরিবেশে কেটেছে—ফলে প্রায় নিরুদ্বেগে পড়াশুনোর মাঝে মার্কসের সময় কেটে যেত। অবশ্যই সময়ে সময়ে এমন অবস্থাও হয়েছে লেখবার জন্যে কাগজ কেনার পয়সাও ছিল না—আর লেখা শেষ হলেও ডাক মারফৎ লেখা পাঠাতে ডাক টিকিটের খরচও চেয়েচিন্তে জোগাড় করতে হয়েছে। আর্থিক দুর্ভাগ্য সারা জীবন মার্কসের পিছু পিছু তাড়া করেছে।

দুঃখের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মার্কস সুখের মুখ দেখার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠেননি কখনো। জীবনে অনেক প্রলোভনই মার্কস এড়িয়ে এসেছেন। নিজের মনোভাব একদা মার্কস খুব পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন: "I must follow my good through thick and thin and I shall not permit bourgeois society to make me into a money making machine"। মার্কসের ওই ইস্পাতকঠিন চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁর কোনো কোনো ব্যক্তিগত চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়। যে চিঠিতে মার্কস নিজের আর্থিক বা পারিবারিক দুরবস্থার কাহিনী মর্মান্তিক অস্থির চিত্তে ব্যক্ত করেছেন, সেই চিঠিতে কয়েক লাইন পরেই দেখা যাবে কোনো এক গূঢ় সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতা বিচারশীল ধীর মেজাজ নিয়ে অবিচলিত মনোভাবে সহজভাবে আলোচনা করছেন।

পারিবারিক ও মানসিক যন্ত্রণার শেষ ছিল না—তবু মার্কস দিনের সমস্ত ক্ষণ কাজ করতেন বৃটিশ মিউজিয়ামে। কমিউনিস্ট লীগের দায়-দায়িত্ব কিছু দিনের জন্য চুকেছে। বিপ্লবের উদ্দামতাও কেটেছে। নতুন সংকট কালীন অবস্থা আসবার আগেই নতুন তত্ত্বগত অস্ত্রসজ্জায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। মার্কসের ধারণা আর পাঁচ কি ছয় বছর বাদেই ধনতান্ত্রিক য়ুরোপকে ফের আর্থিক সংকটের ধাক্কা খেতে হবে। সেই সংকট যথা সময়েই য়ুরোপে নেমে এসেছিল ১৮৫৭-৫৮ সালে।

ট্রিবিউনের জন্য নিয়মিত সংবাদভাষ্য তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি সংক্রান্ত আরো সুগভীর পড়াশুনায় মার্কস মনোযোগ দিলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আর্থিক সংকট ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব হয় না—এমন এক ধারণায় মার্কস তখন পৌঁছে গেছেন। ধনতন্ত্রের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি,

নিয়মনীতি আত্মস্থ করার সাধনায় মার্কস উঠে পড়ে লাগলেন। উৎপাদনের নিয়মে আর্থিক ব্যবস্থার পরিণতি—ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও সংকট কালীন পরিবেশ মার্কসের পঠিতব্য ও বিশ্লেষণযোগ্য বিষয় ছিল। অধীতব্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সংবাদের বিশ্লেষণ চেষ্টা মার্কসের কাছে সমাজ-সম্পর্কিত তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের সামিল। ফলে মার্কসের সংবাদভাষ্য পরবর্তীকালে অসাধারণ সমাজতাত্ত্বিক রচনা হিসেবে স্থায়ী মূল্য পেয়েছে।

অবশ্যই মার্কসকে এক সাধারণ সাংবাদিক হিসেবে গণ্য করার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তবু ট্রিবিউনের সম্পাদকগোষ্ঠী মার্কসের মননশীলতা দমিয়ে রাখতে পারেননি। এমনকি যে সব খবর অতি তুচ্ছ বলে ধনবাদী সমাজে পরিগণিত হতে পারতো মার্কসের চিন্তার প্রসাদে তা অসামান্য সংবাদ-সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে—মননশীল রচনা হিসেবে স্থায়িত্বও পেয়েছে। এর মধ্যে অনেক সম্পদই হারিয়ে গেছে প্রকাশিত না হয়ে সম্পাদকের বাজে কাগজের ঝুড়ির নীচে চাপা পড়ে—কোনোদিন আর তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কখনো কখনো মার্কসের তথ্যে নিজেদের মতামত চাপিয়ে সম্পাদকেরা রচনায় মার্কসের নাম ব্যবহার করেও রচনার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। প্রতিবাদ জানিয়ে মার্কস বিশেষ কিছু সুরাহা করতে পারেননি। অবশ্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে প্রাত্যহিক সাংবাদিকতার দ্রুত চিন্তার মধ্যে টেনে আনলে তাঁর সব সৃষ্টিই সমান মূল্যবান্ হতে পারে না। সাংবাদিকসুলভ সকল মতামত ও সংবাদভাষ্য অকাট্য যুক্তির ভারে গরীয়ান্ হতে পারে না। তবু ট্রিবিউনের পাতায় পাতায় মার্কসের সাংবাদিকতা সমাজনীতির মূলতত্ত্বকে অসাধারণ সমৃদ্ধিশালী করে রেখেছে। সমকালীন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব মার্কস যথাযথ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ভারতবর্ষ, চীন, মেক্সিকো, উত্তর আফ্রিকার মত অনুন্নত ও পরাধীন দেশগুলির সমস্যা গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও রাশিয়ার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে ট্রিবিউনের পাতায় সংবাদভাষ্য তৈরী করেছেন। একটি কেন্দ্রবিন্দুতেই মার্কসের দৃষ্টি অবিচলিত ও স্থির—সকল রকম পরাধীনতা ও অধীনতার নাগপাশ থেকে মানবমুক্তি। ধনবাদী প্রভুশক্তির বিভিন্ন চক্রান্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব জয় করে দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম মার্কস

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় ট্রিবিউনের পাতায় তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন।

১৮৫৩-র শেষের দিকে য়ুরোপের রাজনীতি জটিল রূপ নিল। দেশে দেশে বিপ্লবের অগ্নিকাণ্ড তখন স্তিমিত। শাসকশ্রেণী নিরুপদ্রব। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, জার্মানী ও ইটালীতে অন্তর্দ্বন্দ্বের দহন নির্বাপিত। এই সময়েই যথারীতি শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার অসন্তোষ যুদ্ধের রূপ নিল। '৪৮-এর বিপ্লবের আগে থেকেই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়ার মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকার বোধ নিয়ে মনোমালিন্য ছিল। বিপ্লবের পরিবেশে শাসকশ্রেণী যখন ঘর সামলাতেই ব্যস্ত, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মনোমালিন্যের আগুন চাপা ছিল। ১৮৫৩-য় এল অনুকূল পরিবেশ। চাপা পড়ে থাকা অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বল্কান উপদ্বীপের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি অনেক আগে থেকেই রাশিয়া নিবদ্ধ করে রেখেছিল। সুযোগ এল ১৮৫৩ সালে। গণবিক্ষোভের তোলপাড় থেমে যেতেই য়ুরোপীয় তুর্কী অধিকৃত অংশের দিকে রাশিয়া তার সাম্রাজ্যবাদী হাত প্রসারিত করে দিল। রাশিয়ার ধারণা ছিল য়ুরোপের অন্যান্য শক্তিমান্ রাষ্ট্র গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে সমর্থন না পাওয়া যাক বিরোধিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এক পক্ষ তার সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়িয়ে চলবে অন্যে চুপ করে থাকবে—সাম্রাজ্যতন্ত্রের নিয়মে এমন হয় না। তুরস্কের পক্ষ নিয়ে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে দিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঘোরতর রূপে বেধে গেল। মার্কস এই যুদ্ধকে স্বাগত জানালেন, কেননা আত্মঘাতী যুদ্ধের অন্তর্দ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যবাদী সকল পক্ষই জখম হবে। শক্তিমান্ শাসকশ্রেণী জখম হলে নিঃসন্দেহে লাভ হবে নিপীড়িত জনতার। মার্কস রাশিয়ার বিপক্ষে তুরস্কের পক্ষ নিয়ে তীব্র সমালোচনা-মুখর সংবাদভাষ্যে ট্রিবিউনের পাতা ভরিয়ে তুললেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে য়ুরোপীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম ও শক্তিশালী পক্ষ হোল রাশিয়ার জার। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিপ্লব মুহূর্তে জারের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য একদা দুই দেশের শাসকশ্রেণীকে শক্তিমান্ করে তুলেছিল। ভবিষ্যতেও দুই দেশের বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে রাশিয়ার জার তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিয়ে শাসকশ্রেণীর সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। অতএব রাশিয়ার পতন জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার মুক্তিকামী বিপ্লবীদের

প্রধানতম কাম্য। গ্রেট বৃটেন বা ফ্রান্সকে সমর্থন জানানো বা তুর্কী সাম্রাজ্যকে স্বাগত করা মার্কস ও এঙ্গেলসের উদ্দেশ্য কোনোক্রমেই ছিল না। একমাত্র লক্ষ্য ঘটনার কোন্ পরিণতি ভবিষ্যত বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে পারে। যুদ্ধকে স্বাগত জানিয়ে যুদ্ধের সকল পক্ষকেই মার্কস ট্রিবিউনের পাতায় যথাযথ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কামনা করেছেন রাশিয়ার পরাজয়।

ভারত প্রসঙ্গে

ভারত সম্পর্কে মার্কসের প্রথম লেখা বেরোয় 'নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন'-এর ৯ই জুন সংখ্যায়, ১৮৫৩ সালে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন চার্টারের প্রসঙ্গে। ভারতবর্ষ তখন বৃটেনের সংবাদপত্রের প্রথম সারির খবর। প্রতি কুড়ি বছর অন্তর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারের মেয়াদ শেষ হয়। ওই চার্টারের অধিকারে কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য ও দেশ শাসনের ক্ষমতা পায়। পার্লামেণ্টের আইনের বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ওই অধিকার দেওয়া হয়। সেবারে চার্টারের আয়ু শেষ হবে ১৮৫৪-য়। অতএব ১৮৫৩-র মে মাসে হাউস অব কমন্সে নতুন চার্টার আইন তৈরীর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। নতুন চার্টার আইন প্রসঙ্গে ভারত শাসন সংক্রান্ত সংবাদের ভাষ্য রচনাই ছিল মার্কসের কাজ। ভারত প্রসঙ্গ মার্কসের কাছে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ডেলী ট্রিবিউনের জন্য নানাভাবে সংবাদভাষ্য রচনা করে মার্কস ভারত শাসন ও শোষণের নিখুঁত প্রক্রিয়া তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে ভারতের সমাজজীবনের দুরবস্থার ছবি, কোম্পানীর শাসনের তিক্ত রূপ, শোষণ-যন্ত্রের কাঠামো, ভারত বাণিজ্যের স্বরূপ, শিল্প ও কৃষির বিনাশ, বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ, ভারতের স্বাধীনতার লড়াই—এ সবের যথাযথ বিবরণ দিয়ে কোম্পানী ও বৃটিশ পুঁজিবাদের (moneyocracy) বিশ্লেষণ সহ মার্কস অসাধারণ সংবাদভাষ্য তৈরী করেছেন একাধিক রচনায়। ভারত সম্পর্কিত আলোচনাগুলি দুই সময়ের ব্যবধানে দুটি সামাজিক ঘটনার পশ্চাৎপটে রচিত হয়েছে। প্রথমটি কোম্পানীর চার্টারের নবরূপায়ণ প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়টি ১৮৫৭-র ভারত বিপ্লবের মুহূর্তে। এ সব আলোচনায় মার্কসের সাম্রাজ্যতন্ত্র (Imperialism) সম্পর্কিত ধারণার পুরাপুরি আভাস পাওয়া যাবে।

ভারত শাসনের প্রশ্নে বৃটিশ শাসকবর্গের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব পার্লামেণ্টে প্রকাশ পেয়েছে। মার্কস তার শ্রেণীগত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বৃটিশ সামন্ত গোষ্ঠী, বণিক্ গোষ্ঠী, নতুন শিল্পমালিক গোষ্ঠী—এই তিন গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে স্বার্থচিন্তায় ভারত শাসনের প্রসঙ্গটিকে দেখে থাকে। এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব হাউস অব কমন্সের বিতর্কে, বিভিন্ন সংশোধন প্রস্তাবে, মূল

আইনের কাঠামোয় কেমনভাবে চেনা যায় মার্কস তার সবিশেষ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীচরিত্র উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত শাসনে বুরোক্র্যাসীর অপার মহিমাও মার্কসের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফৎ সতেরো ও আঠারো শতকের ঐতিহ্য বহন করে উনিশ শতকেও ইংলণ্ডের বণিক্ পুঁজির প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রে সামন্তপ্রভুর সহায়তায় ভারত-শাসন ও ভারত-বাণিজ্যে অধিকার কায়েম করে রেখেছিল। অবশ্যই ১৮৩৩ থেকে ভারত-বাণিজ্যে কোম্পানীর আর কোনো অধিকার ছিল না, কিন্তু ভারত-শাসনের লাভজনক ব্যবসায়ে কোম্পানীর অধিকারে হাত পড়েনি। ১৮৫৩-য় নতুন করে সনদ দেওয়ার সময়ে পার্লামেন্টে শিল্প-পুঁজির মালিকেরা কুড়ি বছরের জন্য কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে ধরে। বৃটেনের পার্লামেন্ট ও আর্থিক জগতে বিতর্কের সূচনায় মার্কস ভারতের দিকে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সুযোগ পেলেন। মার্কস বলেছেন, ভারতশাসন শুধু নয়, আগামী কুড়ি বছরের জন্য ভারতলুণ্ঠনের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলাই ছিল বণিক্ পুঁজি ও সামন্ত প্রভুদের প্রতিনিধি শাসকশ্রেণীর কাম্য। এই অভিযোগ বৃটিশ শিল্পমালিক গোষ্ঠীর বিতর্কেরও ভিত্তি।

ভারতবর্ষকে ঘিরে বণিক্ পুঁজি ও শিল্পপুঁজির অধিকার দখলের লড়াই-এর ঐতিহাসিক দিক্‌টি মার্কস তুলে ধরেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে ভারত ছিল রপ্তানীকারক দেশ। ১৮১৩-র নতুন সনদের পর থেকে ভারত-ইংলণ্ড বাণিজ্য টাকার অঙ্কে প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়—কিন্তু ক্রমে দেখা গেল রপ্তানীকারক দেশ থেকে নেমে ভারত ক্রমশ আমদানীকারক দেশে পরিণত হচ্ছে। বৃটিশ শাসন ও শোষণের অপচেষ্টায় ভারতের শিল্প-অর্থনীতির ভিত্তি ধ্বসে পড়ার ফলে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য বিশেষ করে বস্ত্রের রপ্তানী ক্রমশই হ্রাস পায় আর দেশের মধ্যে স্বল্প উৎপাদনের ঘাটতির পূরণ হয় ব্রিটেনে জাত দ্রব্যাদির বর্ধিত আমদানী থেকে। ভারত ক্রমশ বহির্বাণিজ্যে বৃটিশ শিল্পপণ্যের বিরাট্ বাজার হিসাবেই পরিগণিত হয়। তবু ১৮৪৬-এর পর থেকে এক নতুন বিপত্তির শুরু। ইংলণ্ডজাত পণ্যের ভারতে আমদানী হ্রাস পেতে থাকে।

মার্কস প্রদত্ত সংখ্যাতথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৪৬-এ ২ কোটি ৬১ লক্ষ

টাকার বৃটিশ পণ্যের আমদানী ঘটে ভারতে, পরের বছর থেকে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার অঙ্কে। বৃটিশ রপ্তানীর এই নিম্নগতি শিল্প-মালিকদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বৃটিশ শিল্পপণ্যের ভারতবর্ষের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। কারণ স্বরূপ শিল্প-মালিকদের ধারণা হয় যে, ভারতের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করেছে ("They found out that the power of consuming their goods was contracted in India to the lowest possible point". Marx: The East India Company: Its History and Results)। এই মুহূর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থে যা প্রয়োজন তা হোল ভারতে বৃটিশ পুঁজির রপ্তানী ও তজ্জাত শিল্পোৎপাদন। ফলে শ্রেণীগত অন্তর্দ্বন্দ্বের চেহারা বৃটিশ পার্লামেণ্টে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মার্কস কথিত 'ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল' ইংলণ্ডের শিল্প-মালিকদের স্বার্থবাহক সম্প্রদায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদের দীর্ঘ মেয়াদে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। পার্লামেণ্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা সংকোচনের চেষ্টায় এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই মুখর ছিলেন।

হুইগ পার্টির চার্লস উড ছিলেন পার্লামেণ্ট-মনোনীত ভারত শাসন সংক্রান্ত বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি। শাসনের উন্নতি বিধানের প্রসঙ্গ তুলে উড কয়েকটি সংস্কার সহ নতুন সনদের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে রেখেছিলেন। এই তথাকথিত সংস্কারের নামে শাসন-শোষণের কায়েমী স্বত্ব বজায় রাখার অপচেষ্টা মার্কসের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইংরেজ শাসনে ভারতের কোন্ দিক দিয়ে কী লাভ হয়েছে মার্কস এক একটি আলোচনা প্রসঙ্গে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন।

নতুন বিলে সংস্কারের নামে কোর্ট অব ডাইরেক্টরে কতজন সদস্য থাকবে—ডাইরেক্টরদের বেতন কত হবে—বাংলা দেশের জন্য একজন আলাদা গভর্নরের পদ তৈরী হবে কিনা, ১৮৫৩-র সনদে সংস্কারের নামে ভারত শাসনে এই সব পরিবর্তন আনার কারণে বৃটিশ পার্লামেণ্টে দিনের পর দিন উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে। অথচ শোষণের নাগপাশে বছরের পর বছর পাকে পাকে জড়িয়ে ভারতের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করে ভারত থেকে কোটি কোটি মূল্যের সম্পদ্ আহরণ করা হয়েছে।

সরকারী আয়-ব্যয় থেকে তথ্য তুলে মার্কস দেখিয়েছেন, ভারতে আদায়ীকৃত

বার্ষিক কর থেকে কেম্পানীর অংশীদারেরা লভ্যাংশ ও সুদ বাবদ শতকরা ১৪ ভাগ ও বিলেতে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন ও অফিস চালাবার খরচ বাবদ শতকরা ৩ ভাগ মিলিতভাবে ভারতের রাজস্বের ১৭ শতাংশ প্রায় লুঠ করে নেওয়া হোত। মার্কসের মতে এর পরে সংগতভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে রাজস্বের বাকী অংশের সদ্ব্যয় হবে দেশের মধ্যে। কিন্তু বাকী রাজস্বের শতকরা ৬৬ ভাগ চলে যেত যুদ্ধ ও সেনাবাহিনীর খরচ খাতে, কেবল দুই থেকে তিন ভাগ 'পাবলিক ওয়ার্কস্' নামক বিচিত্র ব্যাপারে খরচ হোত—সেই হিসাবের মধ্যে থাকতো রাস্তা, সেতু, খালসেচ (এমন কি শিক্ষাও)। এছাড়া জনকল্যাণের আর কোনো ব্যাপারেই কোম্পানীর কোনো উৎসাহ ছিল না। মোট রাজস্বের ৬০ ভাগ আসতো জমি থেকে। জমির খাজনা বাবদ দরিদ্র চাষীর সম্পদ্ অপহরণ করে কোম্পানীর রাজস্বের বাড়বাড়ন্ত। অথচ চাষীদের ও কৃষি ব্যবস্থার অশেষ দুর্গতি শুরু হয়ে গেল।

কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থায় অনেকগুলি অপকর্মের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিল লবণ কর। লবণ প্রস্তুত করার একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে রেখে কোম্পানী পূর্বাপেক্ষা তিনগুণ বর্ধিত দামে লবণ বিক্রি করে দামের উপর শুল্ক বসিয়ে রাজস্বের পরিমাণ উচু রাখতো। দেশের প্রতিটি মানুষকে লবণ খাওয়ার জন্য শুল্ক দিতে হয় (মার্কস এই প্রসঙ্গে তথাকথিত বৃটিশ নীতিবাগীশতার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন: ইংলিশ বুর্জোয়া মরালস্)।

বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের অপার মহিমায় শুধু বহির্বাণিজ্য মারফৎ ভারত শোষণ নয়—ভারত থেকে একতরফা সম্পদ্ অপহরণের বিভিন্ন কলাকৌশলও প্রযুক্ত হয়েছে। বণিক্‌তন্ত্রের সঙ্গে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের যোগসাজসে এদেশ থেকে ধন-নির্গমের সম্পূর্ণ ছবি মার্কস গড়ে তুলেছেন। নিম্নোক্ত উপায়ে বিভিন্ন রন্ধ্রপথে ভারতের সম্পদ্ অপসারিত হয়েছে।

১. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রায় তিন হাজার অংশীদারের লভ্যাংশ ও ইণ্ডিয়া হাউসের খরচ বাবদ ভারতের রাজস্ব থেকে দেয় অর্থ।
২. কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ চাকুরিয়াদের পেন্সন বাবদ বরাদ্দ।
৩. ভারতে অবস্থিত সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ চাকুরিয়াদের বেতন

বাবদ দেয় অর্থ যার এক বিরাট্ অংশ বৃটেনে খরচের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো।

৪. ভারতে বসবাসকারী বৃটিশ ব্যবসায়ীদের অর্জিত মুনাফা।

৫. কোম্পানীর বেহিসাবী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খরচের জন্য বৃটেনে সংগৃহীত ঋণের উপর দেয় সুদ।

মার্কস-উল্লিখিত এই পাঁচটি প্রশস্ত নালীপথে ভারতের ধনাপসরণ ঘটেছে।

খাজনা আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জমিদারী ব্যবস্থা ও রায়তওয়ারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে জমির অধিকার থেকে চাষীদের বঞ্চিত রেখে দেশের প্রায় ৯০ ভাগ (১১/১২ ভাগ) মানুষকে স্বত্বচ্যুত করা হয়েছে। অথচ দেশীয় রাজাদের পোষণ করার জন্য বার্ষিক রাজস্বের একটা 'বিরাট্ অংশ, দশ শতাংশেরও বেশি, রাজন্যদের বার্ষিক বৃত্তি খাতে ব্যয়িত হোত। ১৮৫১-৫২ সালে বার্ষিক রাজস্ব ছিল ১,৯৮,০০,০০০ পাউণ্ড। পাবলিক ওয়ার্কস খাতে খরচ হয়েছে ১,৬৬,৩০০ পাউণ্ড, দেশীয় রাজন্যরা পেয়েছে ২৪,৬৮,৯৬৯ পাউণ্ড। অর্থাৎ মার্কসের হিসাবে ইংরেজ সরকার সাধারণ মানুষের অর্থে দেশীয় রাজা ও জমিদারদের পোষণ করে এদেশেও একটি ক্ষমতাবান্ পরগাছা শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছে।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতের স্থাণু নিশ্চল সমাজব্যবস্থার দিকেও মার্কসের দৃষ্টি পড়েছে। বৃটিশ বানিজ্য নিছক নিজস্ব বণিক্ স্বার্থে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ধ্বংস সাধন ক'রে, উৎপাদন ব্যবস্থায় অরাজকতা এনে, ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রচলিত সমাজজীবনের শৃঙ্খলা চূর্ণ করে দিয়েছে। অবশ্য ওই কৃষি ও ছোট ছোট শিল্প-নির্ভর স্থাণু সমাজ ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে কোনো পরি-বর্তনের প্রেরণাও ছিল না। পরিবার ও গ্রামকেন্দ্রিক পরিবর্তনহীন, অনড়, স্বল্পে সন্তুষ্ট জীবনযাত্রায় শাসকশ্রেণীর স্বৈরাচার নিরঙ্কুশ স্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিচিত্র কুসংস্কার আর চিরাচরিত ঐতিহ্যের ভাঁওতায় সমাজের সমস্ত রকম প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশ বাণিজ্যের অনুপ্রবেশে সমাজের স্থাণুত্বের ভিত্তি অবশ্যই টলে উঠেছে—কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটেনি কিংবা নতুন জীবনযাত্রার প্রশস্ত রাজপথও গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসেছে বৃটিশ শোষণ যন্ত্র। চূর্ণ সমাজব্যবস্থার আঘাতে

কর্মচ্যুত বাস্তুচ্যুত সর্বহারা মানুষের সংখ্যাই বেড়েছে। এখানেই মার্কস তাঁর অসাধারণ ঐতিহাসিক উক্তির জন্ম দিয়েছেন :

"England, it is true, in causing a social revolution in Hindusthan was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them...But that is not the question. The question is can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social status of Asia ? If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution." (On Colonialism—The British Rule in India, p. 37)

মার্কসের দৃষ্টি অনুযায়ী বৃটিশ শাসক শক্তি ইতিহাসের অজ্ঞাত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে ভারত-ইতিহাসে দুটো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করবে। প্রথমটি প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ধ্বংস সাধন, দ্বিতীয়টি আধুনিক সভ্যতার বীজ বপন। মার্কসের মতে অন্তত এটুকু মনে রাখা দরকার, ভারত-ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল ধ্বংসমূলক ("The historic pages of their rule in India report hardly anything beyond destruction"—The Future Results of the British Rule in India), বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের শাসনে কোনো গঠনমূলক সদিচ্ছার প্রয়োগ মার্কস দেখেন না। এটুকু মাত্র স্বীকার করেন যে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়েই নতুন অভ্যুত্থান বা আধুনিকতার উজ্জীবন ঘটবে। বৃটিশ শাসনকালের মধ্যেই এই উজ্জীবন শুরু হয়ে গেছে। তা বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের সদিচ্ছার দান নয়।

মার্কসের মতে নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ভারতে নতুন যুগের উজ্জীবনের সহায়ক :

১. তরবারির চাপে বৃটিশ রাজশক্তি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পন্ন করেছে। টেলিগ্রাফজাত সংবাদ আদান-প্রদানের সুযোগে ঐক্য আরো নিবিড় হবে।

২. সুশিক্ষিত বৃটিশ সেনানায়কদের শিক্ষায় লালিত ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পদ্।

৩. স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রচলন ভারতের পক্ষে গঠনমূলক কাজের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

৪. জমিদারী ও রায়তওয়ারী ব্যবস্থাজাত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমাজের মধ্যে ইতস্তত শিক্ষার বিস্তারে এক নতুন সামাজিক শ্রেণীর জন্ম হবে যারা দেশ শাসনে আর য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে উঠবে।

৫. বৃটিশ বণিকৃতন্ত্রের স্বার্থে ভারতে রেলপথের নির্মাণ ও বিস্তার ঘটছে। বাণিজ্যপণ্যের চলাচলের সুবিধার কারণে রেলপথ স্থাপনের প্রয়াস আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞানের জন্ম দেবে। যে দেশে কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য আছে রেলপথ স্থাপিত হলে সে দেশে শিল্পের বিকাশ অনিবার্য। রেলপথের বিস্তার নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা জোগাবে। রেলপথই হবে আধুনিক শিল্প-উদ্যোগের জনক ও প্রতিপালক।

মার্কসের মতে উপরিউক্ত ঘটনাগুলির সম্মিলিত ও ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জীর্ণ সমাজকাঠামোর উপর নতুন উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটবে—সেই শক্তির সঙ্গে বিদেশী পুঁজিতন্ত্রের সংঘর্ষ অনিবার্য।

মার্কসের বিশ্লেষণ যে কতটা বস্তুনিষ্ঠ কয়েক বছরের মধ্যেই তা প্রমাণিত হয়ে গেল। ১৮৫৩ সালে মার্কস যা প্রায় ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত উচ্চারণ করেছিলেন, ১৮৫৭-র ভারতীয় বিদ্রোহে তা রূপ নিল। মার্কস সেদিন বলেছিলেন, বৃটিশ সেনানায়কদের শিক্ষায় লালিত সংঘবদ্ধ ভারতীয় সেনাবাহিনী অদূর ভবিষ্যতে স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে। শুধু ভারতীয় সেনাবাহিনী নয়, উৎপীড়িত জনতার বিরাট্ অংশ প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউনে সংবাদভাষ্য রচনায় মার্কস ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পর্কিত ধারাবাহিক রচনার সূত্রপাত করেছিলেন।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপরেখা

১৮৫৭-য় য়ুরোপের কয়েকটি দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এক সাধারণ সংকট দেখা দিয়েছিল। সাত-আট বছর আগেই এই ধরনের অনিবার্য সংকটের আগমন মার্কস ঘোষণা করে রেখেছিলেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক চক্রাবর্তিত সংকট। মার্কসের আগাম ধারণায় অবশ্য এর আরো তীব্র পরিণতি চিত্রিত ছিল। ১৮৪৮-৪৯-এ য়ুরোপীয় বিপ্লবের ব্যর্থতার পর থেকেই মার্কসের এই সময়-ক্ষণটুকুর জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা ছিল।

এই সময়টুকুর আগের ক'বছরে '৪৮-এর ব্যর্থ বিপ্লবের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে ধীরে ধীরে সংহত হতে থাকে। ইংলণ্ডে টেকস্‌টাইল ও যন্ত্রনির্মাতা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে শিল্পাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ক্রমবর্ধমান নাগরিক চাহিদার চাপে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্মাণ ও তৎসংক্রান্ত শিল্পের বিকাশ ঘটে। ফার্নিচার ও গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ বস্ত্র, পাদুকা ইত্যাদি শিল্পে চাহিদার চেয়ে উৎপাদন ঘটে বেশি। ১৮৫৭-৫৮ এর সংকটে ওই সব শিল্পেই দুরবস্থা ঘনীভূত হয়। ছাঁটাই শুরু হয়, বেকারি বাড়ে। এই সুযোগে বিভিন্ন শিল্পে মেহনতী মানুষদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ধীরে ধীরে সঞ্চিত শ্রমিকবিক্ষোভ ১৮৫৯ সালে হঠাৎ এক সাধারণ বিরাট্‌ শ্রমিক ধর্মঘটে রূপ নেয়। উনিশ শতকের ইংলণ্ডে সবচেয়ে বড় সাধারণ ধর্মঘট ঘটে যায়। এই সাধারণ ধর্মঘটে মালিক পক্ষ শ্রমিক সঙ্ঘগুলির সঙ্গে এক চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়। ধর্মঘটে জয়ের প্রেরণায় লণ্ডনে প্রথম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা 'ট্রেডস কাউন্সিল' গড়ে ওঠে।

লণ্ডনের মতই ফ্রান্সেও বাস্তুশিল্পে সংকট দেখা দিয়েছিল। সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি পুরনো সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সক্রিয়তা লক্ষ্য করার মত। প্রুধোঁর অনুগামী বিবর্তনবাদী নেতাদের মতাদর্শের পাশাপাশি ব্লাঙ্কির চরমপন্থী অনুরাগীদের চিন্তাধারা ও গুপ্ত আন্দোলন প্রসার লাভ করতে থাকে। আবার চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী Armand Levy-র নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনে রক্ষণশীলতার অনুপ্রবেশও ঘটে। অবশ্য ফ্রান্সের আর্থিক সংকটের চেহারা

ইংলণ্ডের মত উঁচু পর্যায়ে উঠতে পারেনি। তবু সংকটের ধাক্কায় ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাও পুষ্ট হতে থাকে। ঠিক এই মুহূর্তে সময় বুঝে মার্কস আর অপেক্ষা করলেন না, তাঁর সঞ্চিত তথ্যের সমবায়ে সমাজ ও অর্থনীতির উপর মূল্যবান্ এক পাণ্ডুলিপি তৈরী করে ফেললেন: Basic Features of the Critique of Political Economy. Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie.)

এই পাণ্ডুলিপি কিন্তু সে সময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি। মার্কসের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৩৯ সালে রচনাটি যথাযথ মুদ্রিত হয়েছিল। এই গ্রন্থেই মার্কস প্রথম তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) উপস্থিত করেন। এঙ্গেলস বলেছেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ঠিক এই সময়ে নয়—এরও আগে, ১৮৫০ সালে, মার্কস এর তাত্ত্বিক খসড়া তৈরী করে রাখেন। তখনই তিনি তা প্রকাশ করেননি, কেননা মূল প্রতিপাদ্য তথ্যগত যাচাইয়ের জন্য ফেলে রেখেছিলেন। রচনাটি ছাপাখানায় দেবার সময়ে (১৮৫৯) মূল পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ বদল ঘটিয়ে মার্কস এর নতুন নামকরণ করলেন, Contribution to the Critique of Political Economy.

প্রায় নতুন এই রচনায় মার্কস তাঁর পণ্যমূল্যের তত্ত্বের এই প্রথম এক বিস্তৃত রীতিসম্মত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। পণ্য ও মুদ্রার সামাজিক স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং এ সবের তাত্ত্বিক পরিণতি স্বরূপ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। আর্থিক জগতের এই বিশ্লেষণে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের গতিপ্রকৃতি ও নিয়মকানুন ব্যাখ্যাও হয়েছে। মার্কসীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল মার্কসের বিশ্লেষণ পদ্ধতি—অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় এই পদ্ধতির প্রথম মার্জিত ও সুসংগত রূপ মার্কস প্রকাশ করেছেন এই রচনায়।

আর্থিক ক্রিয়াকলাপের মৌল চার বিভাগ—১. উৎপাদন (Production), ২. বণ্টন (Distribution), ৩. বিনিময় (Exchange) ও ৪. ভোগ (Consumption)। মার্কস প্রথমে এগুলিরই বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস বলেছেন, এই চার বিভাগের মধ্যেকার সংযোগ লক্ষ্য করার মত।

চাহিদা পূরণের জন্য পণ্যবস্তুর উৎপাদন, প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুযায়ী তার বণ্টন ব্যবস্থা—বণ্টিত উৎপাদন আবার বিনিময় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে পরিবেশিত হয়, ভোগ-এর সময়ে অসামাজিক এক্তিয়ার পরিত্যাগ করে ভোগ্যবস্তু ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের সামগ্রীরূপে দেখা দেয়। লক্ষণীয় যে, উৎপাদিত ভোগ্যবস্তু উপরিউক্ত আর্থিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম তিন বিভাগে সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার অধীন কিন্তু চতুর্থ বিভাগে সমাজ সম্পর্ক থেকে তার মুক্তি ঘটে—তখন সে ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে বাঁধা পড়ে।

বিভাগীয় সম্পর্কের এই রূপটিকে আরো তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, উৎপাদন স্বয়ংক্রিয় অকৃত্রিম নিয়মের অধীন, বণ্টন সামাজিক নিয়মাধীন—এই দুটির মাঝামাঝি বিনিময় এক অস্বস্তিকর অবস্থানে রয়েছে। আর্থিক ক্রিয়াকলাপ বা উদ্যোগের মধ্যে ভোগ-এর স্থান নেই। আসলে, আর্থিক উদ্যোগের পরিশেষে কিংবা উদ্যোগের কারণ হিসেবে ভোগ-এর গুরুত্ব।

এর পরে মার্কস দেখিয়েছেন, উৎপাদন ও ভোগ-এর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা সর্বকালীন, সহজাত সম্পর্ক (natural universal conection)। প্রথমত, উৎপাদনজনিত ভোগ, অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের আরো নতুন পণ্যোৎপাৎনে সক্রিয়তা ; দ্বিতীয়ত, ভোগক্রিয়ার দরুন স্বয়ং উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি। ভোগের জন্যই উৎপাদন, ভোগের দরুন চাহিদার সৃষ্টি—চাহিদা, উৎপাদন ক্রিয়ার জনক। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, ভোগ ও উৎপাদন অবিভাজ্য ঘটনার দুটি দিক্—একটি অপরটির অংশ। উৎপাদনের শেষ পরিণতি ভোগে। ভোগের জন্যই পণ্যের পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি। ভোগ চাহিদার সৃষ্টি করে, পণ্যের উৎপাদন চাহিদা মেটায়।

মার্কস বলছেন, এই সহজাত সম্পর্কের কথা বলেই বক্তব্য শেষ করে দেওয়া যাবে না। যাকে আমরা সহজাত সম্পর্ক বলে মনে করছি তা সম্ভব হচ্ছে বণ্টন ব্যবস্থার গুণে। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে যোগসূত্র হোল বণ্টন। বণ্টনের ব্যাপারে ভাসা-ভাসা অর্থে মনে হতে পারে যে, বণ্টন মানে কেবল উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন। কিন্তু পণ্য বণ্টনের পূর্বে আর একটি বণ্টনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তা হোল উৎপাদনের উপায় সমূহের বণ্টন (distribution of the means of production)। উৎপাদন শুরু হওয়ার আগেই উৎপাদনের উপায়গুলি

বন্টিত হয়ে থাকে এবং আমাদের পরিচিত পণ্য বণ্টন প্রক্রিয়া পূর্বনির্ধারিত উৎপাদনের উপায়গুলির বণ্টন ব্যবস্থার প্রভাবেই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং এই বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ঐতিহাসিক কারণেই ঘটে গেছে—আর্থিক নিয়মনীতির প্রকৃতিগত ব্যবস্থা এ নয়।

আবার অর্থনীতিতে বিনিময় ব্যবস্থাকে উৎপাদন ক্রিয়ায় অংশ রূপেই দেখতে হবে এবং উৎপাদন ক্রিয়ার প্রভাবেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাজন (division of labour) থাকার ফলেই বিনিময়ের সূত্রপাত। ফলে, আর্থিক প্রক্রিয়ায় এই চার উপাদান যথা, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ও বিনিময়ের মধ্যে যোগসূত্র দেখা গেলেও এদের পারস্পরিক নির্ভরতা ঐতিহাসিক সম্পর্কজাত। এই ধরনের বিশ্লেষণের সাহায্যেই মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত অর্থনীতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মার্কসের ইচ্ছা ছিল এই রচনাটি তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত এক বৃহদায়তন পুস্তকের প্রথম খণ্ড হিসেবে রচিত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করতে গিয়ে এই ইচ্ছা মার্কসকে পরিত্যাগ করতে হয়। তাঁর বর্তমান 'ক্রিটিকের' প্রতিপাদ্য আট বছর বাদে 'ডাস ক্যাপিটালে'র প্রথম খণ্ডে বিস্তৃততর ব্যাখ্যা সহযোগে উপস্থিত হয়েছে। মার্কস পরে দেখেছিলেন ক্রিটিকে তাত্ত্বিক উপস্থাপনা কিছুটা জটিল রূপ নিয়েছে এবং সাধারণ বিশ্লেষণের পদ্ধতিও সরল হয়নি। ফলে ক্রিটিকের দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করতে গিয়ে মার্কস ডাস ক্যাপিটাল রচনার পরিকল্পনা ছকে নিয়েছিলেন।

পারিবারিক সংকট

ক্রিটিকের রচনা শেষ করে মার্কস এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন: "I don't suppose any one has ever written about money and suffered such a lack of it himself".[১] নিঃসম্বল কপর্দকহীন অবস্থায় মার্কস মুদ্রাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। অবস্থা এমনই করুণ যে রচনার শেষে পুরো পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে ডাক মারফৎ পাঠাবার সামান্য কপর্দকও

১ John Lewis : *The Life and Teaching of Karl Marx*. London 1959.

সেদিন ছিল না। চিঠি পেয়ে এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার থেকে অর্থসাহায্য পাঠালে পর প্রকাশকের ঘরে পাণ্ডুলিপি পৌছয়।

সময়টা মার্কসের জীবনে সবচেয়ে সংকটময়। নিদারুণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলতে হয়েছে। অর্থাভাব, অনাহার, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার দরুন রোগ, সন্তানের মৃত্যু—এক এক করে সব রকম দুর্যোগ মাথায় নিয়ে মার্কসের সংসারযাত্রা নির্বাহ। ঘটনার গতি দেখে মনে হবে, কখনো মার্কসের জীবনে সুদিন আসবে কিনা সন্দেহ—তবু নিশিদিন প্রাণধারণের গ্লানি থেকে মুক্তি নেই।

ইংলণ্ডে আসার পর থেকেই দুর্ভাগ্য মার্কসের জীবনে ছায়ার মত অনুগামী। অর্ধাহার কি অনাহার জীবনে বিরল ঘটনা ছিল না। নিউইয়র্ক ট্রিবিউন থেকে প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিৎ লেখনীমূল্য সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালনের প্রধান সম্পদ্ হলেও এঙ্গেলস অর্থসাহায্য পাঠাতেন। মাঝে মাঝে মার্কসের কাছে দুর্বিষহ ঠেকতো। মনে হোত লেখার কাজ ছেড়ে দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেওয়াই ছিল ভাল—কিন্তু মার্কসের এমন ইচ্ছার পথে প্রধান বাধাই ছিলেন জেনী। জেনীর আশাবাদী মন আর নিজের মনীষার উপর অগাধ বিশ্বাস মার্কসকে বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে বাইরে আসতে দেয়নি।

১৮৫৬ সালে মার্কসের ষষ্ঠ সন্তান ইলিনর-এর জন্ম হয়। ইলিনর জন্ম-কাল থেকে রুগ্ন, ক্ষীণজীবী। তখন কেউ ভাবেও নি যে শিশুকন্যাটি দীর্ঘজীবন পাবে। মায়ের অনেক যত্ন আর আশঙ্কার মধ্যেই ইলিনরের শৈশব কাটে। উত্তরকালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে নেত্রীর আসনে ইলিনর অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।

ইলিনরের জন্মের কয়েকমাস বাদেই মার্কসের সংসারে আবার মৃত্যুর ছায়া পড়লো। এক মর্মান্তিক ঘটনা। মার্কসের তৃতীয় সন্তান এডগার-এর মৃত্যু রোধ করা গেল না। এডগার-এর বয়স তখন এগার। মার্কস ও জেনীর অতি আদরের সন্তান ছিল এডগার। একমাত্র পুত্র বলে নয়—সেই স্বল্প বয়সেই এডগার বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। মনে হোত মার্কসের মেধা এডগারের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে। জন্ম থেকে এডগার রুগ্ন। মৃত্যু হয়েছিল অপুষ্টিজনিত রোগে। যথাযথ পথ্য, ওষুধ ও আহারের সংস্থান থাকলে এডগারকে বাঁচানো সম্ভব হোত। মৃত্যুর আগে পুত্রের রোগশয্যায়

সপ্তাহের পর সপ্তাহ মার্কস নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছেন। মৃত্যু অবধারিত জেনেও মার্কসের কাছে ওই মৃত্যু সম্পূর্ণই অসহনীয় ছিল। উন্মাদপ্রায় মার্কসকে মনে হয়েছিল সেদিন পুত্রের সমাধিগহ্বরেই বুঝি লাফিয়ে পড়বেন। এ সময়ে মার্কসকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন পুত্রের মৃত্যুর পর কয়েক মাস ধরেই মার্কস অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছেন।

পুত্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরে কিছুদিনের জন্য মার্কসের আর্থিক অবস্থার কিছুটা সুরাহা হয়েছিল। জেনীর মায়ের মৃত্যুর পর জেনী মাতৃসম্পত্তির কিছু ভাগ পেয়ে গেলেন। ফলে ডীন স্ট্রীটের অপরিসর গৃহপরিবেশ বদলের সুযোগ এল। গ্রাফটন স্ট্রীটের বড়সড় বাড়িতে গিয়ে ওঁরা উঠলেন। তবু উত্তরাধিকারের পরিমাণ এমন কিছু ছিল না যে মার্কস পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসতে পারে। এঙ্গেলসের সাহায্যের উপর মার্কসকে নির্ভর করতেই হোত।

নতুন বাড়িতে গিয়ে মার্কস অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মার্কসের অমন সুদৃঢ় স্বাস্থ্য সত্যিই ভেঙে পড়ল। এ ব্যাপার হঠাৎ হয়নি। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনার কাজ চালিয়ে যাওয়া—পুত্রের রোগশয্যায় রাতের পর রাত বিনিদ্র অবস্থায় মানসিক যন্ত্রণাভোগ—অর্ধাহার, অনাহারের প্রতিক্রিয়া। যতই সুদৃঢ় স্বাস্থ্য হোক এই পরিবেশে তা একদিন ভেঙে পড়তে বাধ্য। তবু রাত জেগে লেখার কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া মার্কসের উপায় ছিল না। দিনের বেলায় লাইব্রেরী কক্ষে পাঠ ও তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন সভাসমিতি ও আলোচনায় সময় যাপন—রাত্রে লেখার কাজ সেরে দুই কি তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতেন। সুস্থ শরীর নিয়ে এই অবস্থা বছরের পর বছর চলতে পারে না। যকৃতের গোলযোগ, হজমের ব্যাঘাত, হাজারো রকম শারীরিক উৎপাতে মার্কস কাবু হয়ে পড়লেন। এর পরেও মার্কস পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু রুগ্নদেহে, ভগ্নস্বাস্থ্যে মার্কসের জীবন কেটেছে। বারে বারে অসুখে পড়েছেন কিন্তু কাজ থেকে ছুটি নেননি।

অসুস্থ দেহে মার্কস ক্রিটিকের কাজ শেষ করেছিলেন। ক্রিটিক প্রকাশিত হবার বছরে ডারউইন-এর 'দি অরিজিন অব স্পেসিস' বইটি বেরোয়। ডারউইন-এর গবেষণা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। মার্কস ডারউইন-এর গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। মার্কসের অনুরাগী-

বৃন্দ সে সময়ে বিভিন্ন আলোচনা-সভায় জীববিজ্ঞানে ডারউইন-এর কাজের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসের ক্রিটিকের তুলনা দিতেন। ডারউইন-এর তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রেও যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি এনেছে, মার্কসই প্রথম তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই সময়ে মার্কস 'ডাস ফক' (Das Volk) পত্রিকায় প্রাশিয়ার রাজনীতি বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।

ফার্দিনান্দ লাসাল (Ferdinand Lassalle) ছিলেন সুপণ্ডিত ইহুদী আইনবিদ্। মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে লাসালের পরিচয় '৪৮-এর বিপ্লবের সময় থেকে। হেগেলের দর্শনে সুপণ্ডিত লাসাল মার্কসের পাশে দাঁড়িয়ে জনতার সেদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৬০-৬১ সালে লাসাল জার্মানীর রাজনীতিতে প্রতিপত্তিশালী হবার বাসনায় এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিলেন। ইচ্ছে ছিল বন্ধুবর মার্কস ও এঙ্গেলসের সহযোগিতা নেবেন। ১৮৬০-র গোড়ার দিকে মার্কসকে পরিকল্পনা জানিয়ে লাসাল চিঠি দিয়েছিলেন। তারপর গোটা বছর ধরে লাসাল বিভিন্ন চিঠিপত্র মারফৎ পত্রিকার মূলধন ও প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যাপারে মার্কসের পরামর্শ নিয়েছেন। পত্রিকা পরিচালনার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসকে বার্লিনে আসতে অনুরোধ করেছেন। লাসালের ধারণা ছিল সম্রাট চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়মের মৃত্যু হওয়াতে মার্কসের উপর জার্মানীতে প্রবেশ-নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হতে পারে। এর ফলে, পত্রিকা মারফৎ মার্কসের স্থায়ী আর্থিক বন্দোবস্তও হয়ে যাবে হয়তো।

'ক্রিটিক' শেষ করে মার্কস তখন 'ডাস ক্যাপিটাল' রচনায় মন দিয়েছেন। আর 'ডাস ফক' পত্রিকায় প্রাশিয়ার রাজনীতি বিষয়ক নিবন্ধ লিখছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে দিন কাটছে। বার্লিনে যাওয়া মানে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই একটি অসুবিধের প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও পত্রিকা সংক্রান্ত আকর্ষণীয় বিভিন্ন সম্ভাবনা মার্কসকে প্রলুব্ধ করেছিল। প্রথমত স্বদেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে আর কতকাল কাটাবেন ? বার্লিনে পরিচিত পরিবেশে স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ফিরে যাওয়ার আকর্ষণ কোনোমতেই কম ছিল না। দ্বিতীয়ত, বার্লিনে বসে একটা প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র পরিচালনায় অংশ নেওয়া মার্কসের মত রাজ-নৈতিক নেতার কাছে এক মস্ত হাতিয়ার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া। তৃতীয়ত,

এই কাজে আর্থিক সম্ভাবনাও উপেক্ষার বিষয় নয়। মার্কস বার্লিনে গিয়ে লাসালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে স্থির করলেন।

লাসালের সঙ্গে দেখা করে মার্কস শেষ পর্যন্ত নিরাশ হলেন। পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে লাসাল মার্কস ও এঙ্গেলসকে নিজের সমান ক্ষমতা দিতে রাজী নন। লাসালের একটা অহং এবং আত্মসর্বস্ব ভাব ছিল। মার্কসের সঙ্গে কথাবার্তায় লাসাল তা ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেননি। এই অবস্থায় কোনো বোঝাপড়ার মধ্যে যাওয়া মার্কসের পক্ষে নিশ্চিতভাবে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়াও প্রধান অসুবিধে দেখা গেল জার্মান নাগরিকতা প্রসঙ্গে। মার্কসের হয়ে লাসাল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে মন্ত্রি-দপ্তর থেকে আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। অতএব লণ্ডন থেকে চলে এসে বার্লিনবাসী হওয়ার সম্ভাবনা মার্কসের রইলো না।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হোল ১৮৬১ সালের গোড়ার দিকে। এবং এর থেকে মার্কসের আরেক দুর্ভাগ্যের সূচনা। গৃহযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্ক ট্রিবিউন মারফৎ মার্কসের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক এই সময়েই মার্কস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড রচনায় গভীর ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন। স্থায়ী উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্বেও মার্কস ক্যাপিটাল রচনা থেকে বিচ্যুত হননি। ১৮৬২-র শেষে প্রথম খণ্ড ক্যাপিটালের রচনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। মার্কসের আশা ছিল সামনের বছরে মুদ্রণের জন্য পাণ্ডুলিপি শেষ করে ছাপতে দিতে পারবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আরো পাঁচ বছর কেটে যায়। আর এই পাঁচ বছরের অন্তবর্তী কালে মার্কস আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে ভীষণ ভাবে জড়িয়ে পড়লেন।

এই সময়কার প্রথম ঘটনা মার্কিন গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫)। ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন, ফলে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের উদীয়মান ধনতান্ত্রিক শক্তির হাত শক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে ছিল ক্রীতদাস মালিকদের বড় বড় জমিদারী চাষ-আবাদ। লিঙ্কনের ক্ষমতা লাভে দক্ষিণ ভাগের সামন্ত প্রভুরা প্রমাদ গুণতে থাকে। ১৮৬১-র শুরুতে ক্রীতদাস মালিকেরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ

রাষ্ট্রকে এক স্বাধীন কনফেডারেশন রূপে ঘোষণা করে। দক্ষিণ কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হলেন জেফারসন ডেভিস। ফলে মূল ফেডারেশনের সঙ্গে কনফেডারেশনের যুদ্ধ বেধে গেল। শুরু হয়ে গেল মার্কিন দেশের উত্তর আর দক্ষিণের ক্ষমতার লড়াই—এ লড়াই আবার ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধেও সংগ্রামের রূপ নেয়। উত্তর ভাগের উদীয়মান বুর্জোয়ারা ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী ছিল।

মার্কিন দেশের গৃহযুদ্ধ আটলান্টিক পেরিয়ে য়ুরোপের রাজধানীগুলিতে প্রতিক্রিয়ার ঝড় তোলে। ইংলণ্ডের অভিজাত ও বিত্তবান্ সম্প্রদায় ফেডারেশন-পন্থীদের বিপক্ষে। ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীকে লিঙ্কনের পক্ষে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার কাজে মার্কস মন দিলেন। লিঙ্কনের মানবিকতার উপর মার্কসের গভীর আস্থা ছিল। আরো গুরুত্বপূর্ণ হোল য়ুরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর উপর মার্কিন গৃহযুদ্ধের প্রভাব। মার্কিন দেশ থেকে ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হোক—আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর ইচ্ছেও তাই ছিল। অন্তত এই একটি কারণে য়ুরোপের শ্রমিক শ্রেণী উত্তরাংশের বিজয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু বিত্তবান্ ইংরেজ ও দৈনিক পত্রিকার মালিকেরা দক্ষিণাংশের ভূস্বামীদের সমর্থনে নানা তত্ত্ব ও যুক্তি তুলে ধরে দক্ষিণীদের বিজয় কামনা করে চলছিল। স্থানে স্থানে অভিজাত নেতৃবৃন্দ সভাসমিতি মারফৎ কনফেডারেশনের বিচ্ছেদকামী চেষ্টার সমর্থন জানায়। মার্কস বললেন, উত্তর ও দক্ষিণের লড়াই—দুই সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার লড়াই। এক পক্ষে দাস ব্যবস্থা অধ্যুষিত এক-ফসলী কৃষিপ্রধান সমাজ, অন্য পক্ষে মুক্ত শ্রম ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্প প্রধান সমাজ।

ইংলণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার সরকার ফরাসী সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনে তখন ব্যস্ত। ইংলণ্ডের শাসক শক্তির ইচ্ছে ছিল ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ত্রিশক্তির মিলিত চেষ্টায় আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের বিবাদ ওঁরা মিটিয়ে দেবেন—বিবাদ মেটানোর শর্ত হবে উত্তর ও দক্ষিণের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদকরণ ও দুই স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন। ইংলণ্ডে তখনও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কোনোরকম জনমত গড়ে ওঠেনি। জনমত বলতে যা ছিল তা হোল অভিজাত ও শাসক শ্রেণীর সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়াপন্থী বক্তব্য।

কিন্তু ধীরে ধীরে জাগ্রত জনমতের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সমর্থনে ইংলণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা সভাসমিতির মারফৎ বক্তব্য রাখতে শুরু করে। ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এর ফলে নতুন পটভূমিকায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আন্দোলনের এই পর্যায়ে মার্কসের ভূমিকা ইংলণ্ডের যে কোনো শ্রমিক নেতার চেয়ে বেশী ছিল। মার্কসই প্রথম শিল্পাঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একত্র করে ইংরেজ সরকারের লিঙ্কন বিরোধী প্রচেষ্টায় প্রতিবাদ জানাতে উদ্বুদ্ধ করেন। জর্জ ইকেরিয়াস (George Eccarius) ছিলেন লণ্ডন ট্রেডস কাউনসিলের জনপ্রিয় নেতা ও মার্কসের মন্ত্রশিষ্য। মার্কসের প্রেরণায় ইকেরিয়াস দাস প্রথা বিরোধী শ্রমিক জাগরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অসংখ্য সভাসমিতিতে মার্কসের নির্দেশমত লিঙ্কনের সমর্থনে দাস প্রথা বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকে। লণ্ডনে ও শিল্পাঞ্চলে বিরাট্ বিরাট্ শ্রমিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়। রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট ও স্টুয়ার্ট মিলের মত উদারপন্থী চিন্তাবিদেরা মার্কসের পরিকল্পনা মত শ্রমিক সংহতির পাশে এসে দাঁড়ান। ফলে সমস্ত ইংলণ্ড ব্যাপী জনমতের জোয়ারে ইংরেজ অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রগতি বিরোধী প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে আসে। প্রকাশ্য স্থানে লিঙ্কন বিরোধী সভাসমিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্দোলনের তীব্র আঘাতে ইংরেজ সরকার দক্ষিণীদের সমর্থনে সরকারী চেষ্টা থেকে বিরত হতে বাধ্য হন।

কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল

'৫৭-৫৮ সালের ধনতান্ত্রিক সংকট থেকে যে শ্রমিক জাগরণের শুরু হয়েছিল '৫৯ সালে তা সংহত রূপ নেয় কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা লণ্ডন ট্রেডস কাউনসিলের সংগঠনে। এই শ্রমিক সংস্থা দুটি আন্তর্জাতিক ঘটনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। প্রথমটি মার্কিন গৃহযুদ্ধে, দ্বিতীয়টি রাশিয়ার প্রচলিত ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় আন্দোলনটিও একই সময়ে প্রথমটির সঙ্গে সুপরিচালিত হতে থাকে। '৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন রাশিয়ায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার ঢেউ এসে পৌঁছয় রাশিয়ার অধীনস্থ পোলাণ্ডে। পোলাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। পোলাণ্ডের যথার্থ দাবি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমাজবাদী নেতাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। স্বাভাবিক ভাবে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনে পোলাণ্ডের সমর্থনে স্বতস্ফূর্ত গণজাগরণ দেখা দেয়। লণ্ডনে আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শ্রমিকদের মিলিত চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংহতির দাবিতে অনুকূল সরকারী প্রভাব বিস্তারের দাবি উঠতে থাকে। ঠিক হয়—১৮৬৩ সালের ২২শে জুলাই লণ্ডনে পোলাণ্ডের সমর্থনে কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ফরাসী শ্রমিক নেতারাও এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। ট্রেডস কাউনসিলের আরেক কেন্দ্রীয় সভায় সমস্ত য়ুরোপের শ্রমিক শ্রেণীর মিলিত সংহতির প্রস্তাব আলোচিত হোল। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শুরু।

প্রথম আন্তর্জাতিকের আবির্ভাব কালে সংগঠনের সঙ্গে মার্কসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই মার্কসকে দেখা গেল অন্যতম নেতারূপে। কেবল অন্যতম নেতা নয়, মার্কস হলেন আন্তর্জাতিকের প্রেরণা সঞ্চালক নেতা। আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচালক সমিতিকে বলা হোত জেনারেল কাউনসিল। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সঙ্ঘ থেকে জেনারেল কাউনসিলে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল। পরিচালক সমিতিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালিয়ান কর্মীরা ছিলেন, পোলাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের

নেতারা ছিলেন, জার্মানী ও বেলজিয়ম বিতাড়িত সমাজবাদী কর্মীরা ছিলেন—ছিলেন কার্ল মার্কস ও ইকেরিয়াস। জেনারেল কাউনসিলের প্রথম সম্পাদক বৃটিশ শ্রমিক ক্রেমার (W. R. Cremer), সভাপতি ওজার (George Odger)।

আঠারোশ চৌষট্টির আটাশে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকের প্রথম সভা বসে। মার্কস সেদিন সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন বক্তৃতামঞ্চে। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে মার্কস নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। উদ্যোক্তারা একজন জার্মান শ্রমিক বক্তার সন্ধান মার্কসের কাছে চেয়েছিলেন। মার্কসের নির্দেশেই জার্মান শ্রমিকদের তরফ থেকে বক্তৃতা করেন ইকেরিয়াস। এঙ্গেলসকে এই সমাবেশের সংবাদ দিয়ে[১] মার্কস নিজের উপস্থিতির ঘটনাটি জানাচ্ছেন: 'বক্তা হিসেবে নয়, বক্তৃতামঞ্চে নীরব দর্শক হিসেবে (as a mute figure in the platform)।' সেদিনের সেই নীরব দর্শক অত্যল্প কালের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ স্বরূপ হয়ে উঠলেন। সেদিনের সভায় জেনারেল কাউনসিল বা প্রথম পরিচালক সমিতিতে মার্কস নির্বাচিত হলেন। জেনারেল কাউনসিলের আশু করণীয় ঠিক হোল:

ক. বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সঙ্ঘগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন,

খ. এক দেশের শ্রমিক আন্দোলনের খবর অন্য দেশে প্রেরণ,

গ. বিভিন্ন দেশের শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার পরিসংখ্যান সংগ্রহ,

ঘ. শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলির অনুধাবন,

ঙ. কোনো আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কালে বিভিন্ন দেশে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির এক ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম অনুসরণ, ও

চ. সঙ্ঘের কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদের প্রকাশ।

এই সঙ্গে সাধারণভাবে ঠিক হয়েছিল যে, প্রতি বছরে একবার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে জেনারেল কাউনসিলের নির্বাচন হবে এবং বিভিন্ন দেশে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলি তাদের কার্যবিধির স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে।

পরিচালক সমিতি তৈরী হোল কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট লিখিত কার্যবিধি ছিল না, সংগঠনবিধি ছিল না, এমনকি নামও ছিল না। সমিতির সভায় নামের

১ Letter No. 71. The Correspondence of Marx and Engels, 1945

প্রস্তাবটি আনেন ইকেরিয়াস। নামকরণ হোল, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (International Workingmen's Association)।

নাম ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সমিতির কার্যবিধি (প্রোগ্রাম) আর সংগঠন (organisation) নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। একটি উপসমিতির উপর ওই দুটি রচনার ভার পড়ে, উপসমিতিতে মার্কস ছিলেন। ইতালিয়ান বিপ্লবী মেজর উল্‌ফ ও ওয়েনবাদী (Owenite) সমাজতন্ত্রী জন ওয়েস্টন দুটি খসড়া অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করেন। খসড়া দুটি অনুমোদন লাভ করেনি। ফরাসী প্রতিনিধি লুবেৎস (Lubez) আর একটি নতুন খসড়া তৈরী করলেন। লুবেৎসের খসড়া নিয়ে মার্কসের বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা সভা বসে—শেষ পর্যন্ত মার্কসের উপর নতুন করে রচনার দায়িত্ব অর্পিত হোল। কয়েক দিনের শ্রমে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের বক্তব্য, কর্মবিধি এবং সংবিধান মার্কস তৈরী করলেন। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্ঘ সম্পর্কিত মার্কসের সেই রচনা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ও সংগঠন সম্পর্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক দলিল: Inaugural Address to the International Workingmen's Association—এর সঙ্গে রয়েছে সঙ্ঘের সংবিধান (General Rules)।

মার্কস এই দলিলে বলেছেন রাজনৈতিক লড়াই-এর মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের অবসান ঘটাতে হবে। "শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্য লাভের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে তার সংখ্যাধিকতা। কেবল সংখ্যাধিকতায় জয়ের পাল্লা ভারী হবে না যদি-না সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে ঐক্য ও তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হয়।" প্রতি দেশে দেশে মুক্তির সংগ্রামের জন্য শ্রমিকেরা যেমন ঐক্যবদ্ধ হবে তেমনি আন্তর্জাতিক একতার বন্ধনও গড়ে তোলা প্রয়োজন। ওই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধবাদী জঙ্গী ও লুণ্ঠন প্রয়াসী মনোভাবকে প্রতিরোধ করতে হবে।

দলিলে সংযোজিত সংবিধানে শ্রমিক সংস্থা গঠনের মূলনীতিগুলি বিবৃত হয়েছে, যেমন,

ক. শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারাই সম্ভব।

খ. সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের অবসান ঘটানোর জন্য শ্রমিক মুক্তির আন্দোলনে এসে মিলিত হবে।

গ. পৃথিবীর সব দেশের শ্রমিক ঐক্যের ভিত্তিতেই পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো সম্ভব।

ঘ. শ্রেণীগত স্বার্থে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলেই শ্রমিক সম্প্রদায় বিত্তবান্ শ্রেণীদের পার্টি সমূহের বিরোধিতা করতে সক্ষম হবে।

ঙ. ওই ধরনের পার্টি সমাজতন্ত্র রচনা ও সমাজ থেকে শ্রেণীবিভেদ উচ্ছেদের অপরিহার্য হাতিয়ার।

চ. অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সম্ভাব্য সংহতি ধনিকতন্ত্রের রাজনৈতিক অধিকারের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে চাপসৃষ্টিকারী যন্ত্রের মত কাজ করবে (lever).

মার্কস-রচিত এই উদ্বোধনী ভাষণ আর সংগঠনবিধি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রেণী-সংগ্রামের এক সাধারণ বিস্তারিত সূত্র রচনা করে দিয়েছে যাকে কেন্দ্র করে সুগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক এই ঐক্যের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী নিজস্ব পার্টি গঠন করে রাজ-নৈতিক সংগ্রামে নামতে পারবে।

সাম্যবাদী ইস্তাহার (The Communist Manifesto) রচনার সতের বছর বাদে মার্কস নতুন করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের মূলনীতিগুলি এই দলিলে বিশদ করে বললেন।

প্রথম দলিল (সাম্যবাদী ফতোয়া), শ্রমিক ও নির্বিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কিত তত্ত্বজ্ঞান, ঐতিহাসিকতা এবং অনিবার্যতা প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় দলিল প্রথমটির তত্ত্বজ্ঞানের প্রযুক্তি প্রসঙ্গে মূলনীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ—সমস্যার সমাধান চেষ্টা। সাম্যবাদী ফতোয়া যখন রচিত হয় নির্বিত্ত শ্রেণীর দল গঠনের তখন সূচনা—উদ্বোধনী ভাষণ রচিত হোল এক বিস্তৃত ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

মার্কসের প্রস্তাব মত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য সংগ্রহ শুরু হোল। ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের বাইরে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। মার্কসের 'উদ্বোধনী ভাষণে'র ৫০ হাজার কপি বিতরিত হোল। ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে কয়েক সহস্র শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যপদে নাম লেখালেন। প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ মার্কিন গৃহযুদ্ধে দাস প্রথা বিরোধী সংগ্রামে যথেষ্ট সমর্থন জুগিয়েছে। পোলাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে

আন্তর্জাতিকের দানও কম নয়। এই ব্যাপারটিতে মার্কসকে সংকীর্ণতাবাদীদের সঙ্গে বিতর্কে নামতে হয়েছিল।

কোনো কোনো তাত্ত্বিক পোলাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর করণীয় কিছু নেই বলেই মনে করতেন। কেন না স্বাধীনতা লাভের পর পোলাণ্ডের অভিজাত শ্রেণীরাই লাভবান হবে—ক্ষমতা আসবে তাদের হাতেই। রাশিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত পোলিশ অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত সরকারে নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো লাভ নেই। মার্কস বললেন, স্বাধীন পোলাণ্ডে সরকার যার হাতেই থাকুক সেই সরকারের গণতান্ত্রিক রূপ কিছুটা বিকীর্ণ হবেই। সমাজবিকাশের নিয়মই এটা। বিশেষ করে সমস্ত য়ুরোপের নির্বিত্ত শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে মুক্তিপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক পোলাণ্ডের উদ্ভব হওয়া বিশেষ প্রয়োজন—পোলাণ্ডে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তৃত থাকার অর্থই হোল য়ুরোপে প্রতি-বিপ্লবের ঘাঁটির দীর্ঘ জীবন পাওয়া।[১] এ ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল—১৮৬৬-র অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ। য়ুরোপীয় রাজনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ একাধিক আলোচনা সভা বসিয়ে স্থির করেন যে দু দেশের অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের এই লড়াইতে শ্রমিক শ্রেণী কোনো পক্ষই নেবে না। আপন মুক্তির পথ প্রশস্ত করার কাজে শ্রেণী সংগঠন শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট থাকবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সমর্থন পেয়েছিল। এমনকি ইংলণ্ডের বিভিন্ন শ্রম-বিরোধে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ নেতৃত্ব করায়ত্ত করে নেয়। ফলে বিরোধী সামাজিক শ্রেণীদের কাছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ছিল কখনো 'গুণ্ডার দল' কখনো বা 'লুটেরা ও সন্ত্রাসবাদীদের' সংস্থা মাত্র। কিন্তু এত সব বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও শ্রমিক আন্তর্জাতিক ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে। সংস্থার মুখপত্র হিসেবে একটি সংবাদপত্র বের করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। নাম দেওয়া হোল 'দি ওয়ার্কম্যানস অ্যাডভোকেট', ফলে কাজের চাপ এসে পড়লো সবচেয়ে বেশি মার্কসের উপর। দিনের আঠারো ঘণ্টাই মার্কস আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের জন্য কাজ করে চলেন। কিন্তু পড়াশুনা ও লেখার কাজও কম ছিল না। সঙ্ঘের জেনারেল কাউনসিলের সমস্ত সভায় মার্কস যোগ দিতেন। রাজনৈতিক ও আর্থিক সব রকম আলোচনায় প্রধান ভূমিকা ছিল

১ K. Marx : Instructions to the delegates of the Geneva Congress 1866

মার্কসের। আন্তর্জাতিকের সমস্ত চিঠিপত্রের প্রতিটি লাইন মার্কস মুসাবিদা করে দিতেন। অনেক সময়ে বিনিদ্র রাতেও কাজ করতে হয়েছে। ক্রমশ কাজের এই অসহনীয় চাপে মার্কসের স্বাস্থ্য ফের ভেঙে পড়লো। মার্কস ছিলেন প্রায় অবিরাম ধূমপায়ী। প্রিয় ছিল সিগার। অর্থাভাবে সস্তার সিগারে বিরামহীন ধূমপান স্বাস্থ্যকে রেহাই দেয়নি। মার্কস শয্যা নিলেন। বিশ্রামহীন কাজের চাপে এর আগেও ভেঙে পড়েছিলেন। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন বেশ কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বিশ্রামে কাজ হোল—মার্কস ফের সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ঠিক এই সময়ে একটি আর্থিক প্রশ্ন নিয়ে জেনারেল কাউনসিলে বিতর্ক বেধে ওঠে। প্রশ্ন তুলেছিলেন জন ওয়েস্টন। জেনারেল কাউনসিলের এক সভায় ওয়েস্টন 'শ্রম-বেতনের নিয়ম' সম্পর্কিত এক রচনা পড়লেন। ওয়েস্টন বললেন, সামগ্রিক উৎপাদন থেকেই শ্রমিকের বেতন নির্ধারিত হয়। বেতন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা অর্থহীন, কেন না উৎপাদন বৃদ্ধির ফল হিসেবে শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। সেদিন মার্কস ওয়েস্টনের রচনার যুক্তিপ্রণালী মন দিয়ে শুনলেন। আর বাড়ি ফিরেই শুরু করলেন ওয়েস্টনের বক্তব্যের প্রতিবাদে এক নতুন রচনা—"মূল্যমান, বাজারদর ও মুনাফা" (Value, Prices and Capital)। খুব দ্রুতগতিতে লিখলেও মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের আর্থিক প্রতিপাদ্যের এক অতি সরল সংক্ষিপ্ততম সারাংশ ওই রচনায় প্রকাশ করেছেন। জেনারেল কাউনসিলের সভায় রচনাটি দুদিন ধরে পড়া হোল এবং ওয়েস্টনের বক্তব্য নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল তার উপর যবনিকাও পড়ে গেল।

'মূল্যমান, বাজারদর ও মুনাফা'-এ মার্কস বলেছেন: উৎপাদন বাড়লে শ্রমিকের বেতন বাড়ে না, বাড়ে পুঁজিপতির মুনাফা—মুনাফার অংশভাগ কেটেই শ্রমিকের বেতন বাড়াতে হয়। শ্রমিকের বেতন বাড়াতে হলে মুনাফার অংশ কমাতে হয়। এই প্রসঙ্গে মার্কস পণ্যদ্রব্যের মূল্যমানের নিয়ম (Law of Values), বাজারদরের (Price) সঙ্গে মূল্যমানের (Value) সম্পর্ক, শ্রমমূল্যের স্বরূপ (Value of Labour-power), উদ্বৃত্ত মূল্যের (Surplus Value) প্রকৃতি, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার (Rate of Surplus Value), মুনাফার হার (Rate of Profit), উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে ভাড়া (rent) বা খাজনা, সুদ

(interest) ও মুনাফার উদ্ভব ইত্যাদির অর্থনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। অর্থশাস্ত্রকে মার্কস এই প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরলেন। পরিশেষে মার্কস বলেছেন, এমন কোনো আর্থশাস্ত্রীয় নিয়ম নেই যা নাকি একই সঙ্গে মুনাফা ও শ্রম বেতনের পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয়। পুঁজিপতি ও শ্রমিক এই দুই যুধ্যমান পক্ষের সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শ্রমবেতন বা মুনাফার পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

মার্কসের এই আলোচনায় কেবল ওয়েস্টনের সমালোচনা নয়, প্রুধোঁ-মতাবলম্বীদেরও সমালোচনা করা হয়েছে। প্রুধোঁর তত্ত্বে শ্রমিক আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকৃত নয়, প্রুধোঁর মতে আন্দোলনের প্রয়োজনই হয় না। পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্মিলিত সদিচ্ছায় শ্রমিকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মার্কস নির্দেশিত তত্ত্বে ক্রমাগত শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমমূল্যের নিম্নগতি রোধ করা সম্ভব এবং শ্রম-সময়ের (hours of labour) সংক্ষেপকরণ সাধ্যায়ত্ত। জেনারেল কাউনসিলে আপাতত শ্রম বিরোধ সংক্রান্ত বিতর্ক চাপা পড়ে গেল—কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনে ভবিষ্যতের জন্য আরো বড় আকারে ওই বিতর্ক তোলা রইলো। মার্কসের ওই সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক আলোচনা আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউনসিলে গৃহীত হয়। মোটামুটি ভাবে ঠিক হয়েছিল আন্তর্জাতিকের আগামী সম্মেলন উপলক্ষে পুস্তকাকারে তা প্রকাশ করা হবে। যাই হোক, 'মূল্যমান, বাজারদর ও মুনাফা'-র প্রকাশ মার্কসের জীবিত কালে আর সম্ভব হয়নি। মার্কস নিজেই সেদিন এই রচনার প্রকাশ চাননি কেন না যে বইয়ের অংশ বিশেষ থেকে এই রচনার মূল বক্তব্য নেওয়া সেই বইটিও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। মার্কসের মৃত্যুর পর মার্কস-কন্যা ইলিনর পিতার কাগজপত্রের মধ্যে এর পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান। ১৮৯৮ সালে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়।

ইংলণ্ডে তখন সার্বজনীন ভোটাধিকার নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। শুরু হয়েছে '৬৪ সাল থেকেই। মার্কসের পরামর্শ মত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ সমস্ত শক্তি নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের নেতারা ইংলণ্ডের অন্যান্য স্বাধীন জীবিকার মানুষদের নিয়ে যুক্ত কমিটী তৈরী করলেন। আন্তর্জাতিকের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে হাত মেলালেন আইনজীবী, বিচারক, ছোটখাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চাকুরিজীবী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা।

শ্রমিক সংহতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওরা আন্দোলনের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই আন্দোলনে মার্কসের যেমন সমর্থন ছিল তেমনি আন্দোলন সার্থকতায় পর্যবসিত করার পেছনে জেনারেল কাউনসিলকে সক্রিয় করার জন্য মার্কসের চেষ্টার কমতি ছিল না। এঙ্গেলসকে এক চিঠিতে মার্কস জানাচ্ছেন :

"The Reform movement here which our Central Council called into existence and in which I played a great part has now reached immense and irresistible dimensions. I have kept behind the scenes all the time and do not trouble myself further about the affair since it has been set going."[১] এই প্রসঙ্গে ইতিহাস হোল ১৮৬৮-এর রিফর্ম অ্যাক্ট ইংলণ্ডের জনসাধারণের ভোটাধিকার বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এই আইনে আন্দোলনের সমস্ত দাবি যথাযথ ভাবে সরকার মেনে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত এক আপোষ মীমাংসায় এই আইনের বলেই শহরের শ্রমিকেরা ভোটাধিকার পায়। যুক্ত কমিটীর মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিরা সরকারের এই মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের নির্বিত্ত মানুষদের জন্যও ভোটাধিকার আদায় করে নেওয়া হবে এই মর্মে আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। তবু আন্দোলনের চাপেই শহরের মধ্যবিত্ত ও নির্বিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ভোটাধিকার অর্জন করে নিতে পেরেছিল।

প্রথম আন্তর্জাতিক ১৮৭২ সাল পর্যন্ত য়ুরোপের বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর অত্যধিক কেন্দ্রীভূত সংস্থা হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছে। বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক শাখায় বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগত সদস্যেরা জাতীয় সংস্থা গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা দল হিসেবেও আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্তি গ্রহণ করে। প্রথম দিকে আন্তর্জাতিকে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন মতের সমাবেশ ঘটেছিল। মার্কসপন্থীদের সঙ্গে ফ্রান্সের প্রুধোঁ-মতাবলম্বী ও ব্লাঙ্কির অনুগামীরা, ইতালি, স্পেন এবং সুইস ফেডারেশনের বাকুনিনপন্থীরাও আন্তর্জাতিক সংস্থায় এক সাধারণ সহাবস্থানে মিলিত হয়েছিল। সেণ্ট মার্টিন'স হলের উদ্বোধনী সভা থেকে আরম্ভ করে জেনিভা কংগ্রেস পর্যন্ত আন্তর্জাতিকের প্রথম দু'বছরের ইতিহাসে দেখা যায় যে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের একশোর উপর প্রতিষ্ঠান,

১ Letter No. 91. 9th October 1866. Marx-Engels Correspondence.

ছোট বড় সংস্থা, আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্তি গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিকে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের সঙ্ঘ, যেমন বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সমবায়, ফরাসী কো-অপারেটিভ সংস্থাগুলি, জেনিভার ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা, বেলজিয়মের 'স্বাধীন চিন্তা'র সমর্থকেরা, মার্কসের অনুগামীরা, এমনকি দেশবিদেশের গণতন্ত্রী বুর্জোয়ারাও।

তবু এটা লক্ষণীয়, বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের সহাবস্থান সত্ত্বেও মার্কসের প্রভাব আন্তর্জাতিক আন্দোলনে দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। শ্রমিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য মার্কস শ্রমিক আন্দোলনে অত্যন্ত শক্তিশালী তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। মার্কসের ঐতিহাসিক সমাজবাদ, বস্তুবাদী দর্শন আর অর্থনীতি সম্মিলিত ভাবে নির্বিত্ত শ্রেণীর সংগ্রামের যথাযথ হাতিহার রূপে প্রযুক্ত হতে পেরেছে আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনায়। মার্কিন গৃহযুদ্ধের দাস প্রথা বিরোধী সংগ্রামে, পোলাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে, ইংলণ্ডের সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রসঙ্গে, শ্রমজীবী শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নে, ইংলণ্ডের কারখানাগুলিতে শ্রমিকের দৈনিক কাজের সময় দশ ঘণ্টায় কমিয়ে আনার ব্যাপারে; রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিরোধী সংগ্রামে—মার্কসের তাত্ত্বিক হাতিয়ার, মার্কসের প্রেরণা ও নেতৃত্ব আন্তর্জাতিকের দ্রুত প্রভাব বৃদ্ধির কারণ হিসেবেই দেখা যাবে। সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রায়িত রূপ গড়ে তোলার কাজে আন্তর্জাতিকের দান অনস্বীকার্য। বিশ্বের শ্রমিক ঐক্যের প্রথম সাফল্য আন্তর্জাতিকেরই দান। আবার আন্তর্জাতিকের মত সুবিশাল ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংস্থাও পক্ষান্তরে মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

সেণ্ট মার্টিন'স হলের উদ্বোধনী সভাতেই ঠিক হয়েছিল পরের বছর সেপ্টেম্বরে ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিকের প্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সম্মেলন হয়েছিল লণ্ডনে সেপ্টেম্বরেই। প্রথম কনফারেন্সে অবশ্য আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক দৈন্য প্রকাশ পায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুইজারল্যাণ্ড মাত্র এই চারটি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। মার্কস বেসরকারী জার্মান প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। তবে যথার্থ শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখতেন ইংলণ্ডের ওজার, ক্রেমার ও জর্জ হাওয়েল। প্রথম সম্মেলনেই মার্কসের সঙ্গে প্রুধোঁ-মতাবলম্বীদের মতপার্থক্য দেখা দেয়।

ফরাসী প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই প্রুধোঁ-শিষ্য। য়ুরোপে রাশিয়ার আচরণ সম্পর্কিত আলোচনায় ফরাসী প্রতিনিধিরা ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় য়ুরোপের বিশেষ করে শ্লাভ দেশগুলির যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ ছিল। অধিকন্তু পোল্যাণ্ডের পরাধীনতার প্রশ্নও ছিল। প্রুধোঁর তত্ত্ব অনুযায়ী ফরাসী প্রতিনিধিরা শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আচরণের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘে কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাব বা কর্মপ্রণালীর উপযোগিতা নেই। এমনকি ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য প্রয়াসের জন্য ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর আন্দোলনও প্রুধোঁর সমর্থন পায়নি।

প্রথম কংগ্রেস ঃ পরের বছর জেনিভায় প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার কালে রুশ-পোলিশ প্রশ্ন তীব্র আকারে দেখা দেয়। পোলাণ্ডের স্বাধীনতার সমর্থনে আলোচিত প্রস্তাবে রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও ধ্বংস কামনা সংগতভাবেই এসে পড়ে। সম্মেলনে রাজনৈতিক মূল প্রস্তাবের খসড়ায় মার্কস বলতে চেয়েছিলেন য়ুরোপের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে সবচেয়ে বড় বাধা রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টা। রাশিয়ার জারতন্ত্রকে য়ুরোপের বুর্জোয়া ও অভিজাত জমিদার শ্রেণী শেষ দুর্গ হিসাবে কাজে লাগাবে। উপরন্তু পোলাণ্ডের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারলে জারতন্ত্রের শক্তি খর্ব হয়ে পড়বে। কিন্তু ফরাসী প্রতিনিধিদের বিরোধী আচরণে সবে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক মতবিরোধে ভেঙে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় ওই প্রস্তাবকে কিছুটা সংশোধন করে রুশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও পোলাণ্ডের স্বাধীনতা প্রয়াসকে নামমাত্র সমর্থন জানানো হোল।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির সূচনা মুখে মার্কস ফরাসী সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সঙ্গে বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যই চেয়েছিলেন। বৃটিশ ও ফরাসী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গোটা য়ুরোপের গণমুক্তি আন্দোলনে সবচেয়ে বড় ঘটনা বলেই মার্কস মনে করতেন। মার্কসের ধারণামত এই ঐক্যই অনতিদূর ভবিষ্যতে ফ্রান্সের রক্ষণশীল দুর্গ চুরমার করে সারা য়ুরোপে বিপ্লবের প্রসার ঘটাবে। এই ঐক্যের খাতিরেই মার্কস ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের আপত্তির কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন। মনে হওয়া হয়তো অসংগত নয় যে প্রথম কংগ্রেসে

প্রুধোঁ-মতাবলম্বীদের জয় করা যায়নি। তত্ত্বগত কঠোরতার যুক্তির দাবিতে নতুন গড়ে ওঠা ঐক্যে ফাটল ধরাতে মার্কস রাজী ছিলেন না। সার্বিক আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রযুক্তিগত কৌশলের প্রয়োজনীয়তা লণ্ডন কনফারেন্সে মার্কস তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

এই কৌশলের জোরেই প্রুঁধো-মতাবলম্বীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্কস শ্রম ও পুঁজির বিরোধের আসল চিত্রটি সম্মেলনে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। প্রুধোঁ-মতাবলম্বীরা যখন পুঁজিবাদী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর শুভ সমন্বয় জাত শ্রমিক মঙ্গলের উপর জোর দিয়ে চলেছেন মার্কস তখন আন্তর্জাতিকের কার্যবিধিতে পুঁজিবাদের চক্রান্ত ধ্বংস করার প্রস্তাব রাখছেন। কার্যবিধিতে তত্ত্বগত চরম রাজনৈতিক প্রস্তাবের পাশাপাশি শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা কমিয়ে আনার দাবিও রয়েছে—দৈনিক দশ ঘণ্টার বদলে আট ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব। মার্কসের মতে শ্রমসময় কমিয়ে আনার একমাত্র উদ্দেশ্যই হোল শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষা, আত্মিক উন্নতির সুযোগ, সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখার সুযোগ, রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ। এই সঙ্গে শিশু ও বালক শ্রমিক সংক্রান্ত প্রশ্নও এসেছে—শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক পরিবেশের ভয়াবহতা দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, এই পরিবেশে পুঁজির সঞ্চয়ের কারণে মানুষকে নিছক যন্ত্রে পরিণত করা হয়—, যে কোনো শ্রমিক পিতা ভবিষ্যতের দাস-পালক (Slave-holder) মাত্র, শ্রমিক পিতাকে নিজের শিশু সন্তান বিক্রেতায় পরিণত হতে হয় এই পরিবেশ থেকে অন্তত শ্রমিক শিশুর মুক্তির ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজে আইন মারফৎ হতে পারে। বিপ্লবী কার্যবিধির পাশাপাশি আইন মারফৎ সমাজ সংস্কারের দাবিও মার্কস রচিত কার্যবিধিতে স্থান পেয়েছে।

সামাজিক আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও মার্কসের সঙ্গে প্রুধোঁ-মতাবলম্বীদের এই ক্ষেত্রেও বিতর্ক বেধে যায়। প্রুধোঁর মতে কোনো সামাজিক আইন নাকি ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর নির্দয় হস্তক্ষেপ। বিপরীত ক্রমে মার্কসের মতে এই ধরনের আইন প্রতিকূল পরিবেশের উপরও প্রভাব বিস্তার করার হাতিয়ার—কেন না সমাজসম্মত যুক্তিবাদ বিধিবদ্ধ আইনে সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কার্যবিধির আরেক অংশে মার্কস পুঁজির সামাজিক চরিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন। মার্কস বলছেন, সঞ্চিত পুঁজির অর্থই হোল বিশেষ এক সামাজিক শক্তি ওই সঞ্চয়ের মধ্যে সংহত হয়ে থাকে—পুঁজির মালিক ওই সংহত শক্তির

অধিকারী আর শ্রমিকেরা শুধু মাত্র শ্রমশক্তির মালিক। ফলে তারাই সমাজে অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক সুবিধা একটি মাত্র—তা হোল সমাজে শ্রমিকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতায়ও ভাঙন ধরে অনৈক্যের আঘাতে। শ্রমিক শ্রেণীর অনৈক্য ও অন্তর্বিরোধ দূর করার একমাত্র পন্থা হোল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এ ছাড়াও পুঁজির সঙ্গে প্রায় নিত্যকার বিরোধে, যথা কর্মস্থলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বেতনবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত শ্রমসময় ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টায় ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্পে সীমাবদ্ধ থেকে ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না—অন্যান্য বৃহত্তর জনকল্যাণকর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধানে ট্রেড ইউনিয়ন গুলিকে এগিয়ে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত গণমুক্তি আন্দোলনের সংগঠনী কেন্দ্র রূপে ট্রেড ইউনিয়নকে নামতে হয় (act deliberately as organizing centres of the working class in the broad interest of its complete emancipation.—(Instructions to the delegates of the Geneva Congress 1866)

জেনিভা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মার্কসের এই ধরনের বক্তব্য ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। শিল্পে যে কোনো প্রকার ধর্মঘট চেষ্টা তাঁদের মতে অযৌক্তিক ও সামাজিক পীড়নের নামান্তর। এমনকি যদি আইন করে দশ ঘণ্টার জায়গায় আট ঘণ্টা শ্রম-সময় কমিয়ে আনা হয় তাও হবে শিল্পের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উচিত হবে না মালিক-শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাথা গলানো।[১]

এ ছাড়াও প্রুধোঁপন্থীরা এক ধরনের প্রস্তাব আনতে চাইলেন যার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘে মার্কসের যোগদান অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাঁরা চাইলেন শুধু মাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকেই আন্তর্জাতিকের সদস্য নেওয়া হবে। অবশ্য এ প্রস্তাব ব্যক্তিগত ভাবে মার্কসের বিরুদ্ধেই কেবল প্রযোজ্য হবার জন্য রচিত হয়নি। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রুধোঁ-পন্থীদের এটি রচনা। ফরাসী রাজনীতির অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখেছেন যে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিচালিত গণতন্ত্রী দল কিংবা ব্লাঙ্কির অনুগামী গুপ্ত চক্রান্ত-

১ J. Braunthal : *History of the International.* p. 126

কারীর দল ফ্রান্সের রাজনীতিতে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁরা চাইলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির মধ্যে যথার্থ শ্রমিক নন এমন ব্যক্তি প্রবেশ লাভের অধিকার পেলে সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফরাসী প্রতিনিধিদের এই ধরনের মতবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতারা। ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই গণতন্ত্রী বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যোগাযোগে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সার্বজনীন ভোটাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনে শ্রেণী সমবায়ে যুক্তভাবে কাজ করার ফলে ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন সেই আদি যুগে লাভবান হতে পেরেছে। ইংরেজ শ্রমিক নেতাদের বিরোধিতায় আন্তর্জাতিকের মধ্যে এই অতিবাম উন্নাসিকতা গৃহীত হতে পারেনি। অন্তর্বিরোধে আন্তর্জাতিক ভেঙে পড়েনি। কংগ্রেসের পর কুগেলম্যানকে লিখিত এক চিঠিতে মার্কস লিখলেন : "I had great fears for the Congress at Geneva. On the whole, however, it turned out better than I expected."[১]

দ্বিতীয় কংগ্রেস : আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস বসেছিল লুসেনে (সেপ্টেম্বর ১৮৬৭)। এই অধিবেশনে মার্কস উপস্থিত হতে পারেননি। তা হলেও মার্কসের অনুগামীদের সঙ্গে প্রুধোঁপন্থীদের ঘোরতর বিতর্ক বেধে যায়। জার্মানী, বেলজিয়ম, ইতালি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড থেকে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সেই একই বিরোধ। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচারে অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিতর্ক শুরু হোল বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতখানি হবে তা নিয়ে। ফরাসী প্রতিনিধিরা স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় অধিকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিক সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন বলেই স্বীকৃতি পায়। শিক্ষার আর্থিক দিক্‌টির প্রশ্নে প্রুধোপন্থীরা শ্রমিক স্বার্থে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি। কিন্তু ঘোরতর বিতর্ক বাধে আন্তর্জাতিকের মূল প্রস্তাবে—উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ মালিকানা ও সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির আলোচনার সময়ে।

---

১ Letter No. 91. Correspondence of K. Marx and F. Engels, 1945

বেলজিয়ান প্রতিনিধিরা রেলওয়ে ও অন্যান্য একচেটিয়া শিল্পের জাতীয়করণ ব্যবস্থার প্রস্তাব তোলেন। প্রস্তাবের বয়ানে কিছুদূর অবধি কারুর আপত্তি ছিল না। ধনতন্ত্রী সমাজের মালিকানা থেকে মুক্তির প্রশ্নে সকলেই ঐক্যমত। কিন্তু সামাজিক অধিকারে নিয়ে এসে পরিচালনার কী ব্যবস্থা হবে—বিরোধ বাধলো তখনই। পরিচালনা হবে স্থানীয় সমবায় সমিতি মারফৎ, না, রাষ্ট্রীয় অধিকারে রাষ্ট্র নিযুক্ত কর্মী মারফৎ। প্রুধোঁপন্থীদের আপত্তি রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রশ্নে—সে রাষ্ট্রের চরিত্র যাই হোক না কেন। রাষ্ট্রীয় অধিকারে আইনগত বাধ্যবাধকতা এড়ানো যায় না। ওঁদের মতে রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা সামাজিক পীড়ন ছাড়া কিছুই নয়। ফরাসী প্রতিনিধিদের আপত্তিতে প্রস্তাবের সবটা গ্রহণ করা যায়নি—সামাজিক মালিকানার প্রশ্নটি অসমাধিত রয়ে গেল।

অর্থনৈতিক মুক্তির কারণে রাজনৈতিক লড়াই-এর প্রস্তাবেও একই বিতর্ক এসে যায়। ধনতন্ত্রী সমাজে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে নেমে আসতে হবে। আর্থিক মুক্তির জন্য রাজনৈতিক আচরণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রুধোঁর মতে সব রকম রাজনৈতিক আচরণ বা ক্ষমতার ব্যবহার পীড়নের হাতিয়ার মাত্র অতএব তা বর্জনীয়। প্রুধোঁর লক্ষ্য সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান—মার্কসের লক্ষ্য, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্পণ।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কংগ্রেসে দুটি বিতর্কিত মতবাদের মধ্যে সেতু বাঁধার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রথমটি, শ্রমিকের সামাজিক মুক্তির সমস্যা রাজনৈতিক মুক্তির সমস্যা থেকে অভিন্ন। দ্বিতীয়টি, শ্রমিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক দায়িত্ব। প্রথম প্রস্তাবটি যথাযথ অবিকৃতভাবে উত্থাপিত হলে মার্কস ও প্রুধোঁর কারুর আপত্তি থাকে না কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থে সুযোগমত রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্ন এসে পড়বে, না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কথাটির যথার্থ অর্থ থাকে না। ঐক্যমতের খাতিরে ব্যাখ্যার সুযোগ ও বিশ্লেষণ উহ্য রেখে প্রস্তাব দুটি আন্তর্জাতিকের মৌলিক নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

তৃতীয় কংগ্রেস : আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হোল ব্রুসেলসে ১৮৬৮-র সেপ্টেম্বর। এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি ছিলেন একশো জন। এই কংগ্রেসেই পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার জাতীয়করণ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির বিভিন্ন দিক ও সুদূরপ্রসারী ব্যাখ্যা সম্পর্কে মার্কস সতর্ক ছিলেন। আন্তর্জাতিকের সাধারণ সভায় বক্তৃতায়, বিতর্কে, প্রস্তাব রচনায় মার্কসের সতর্কতা লক্ষণীয়। এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকের জন্য যে সব খসড়া মার্কস রচনা করেছেন—'উদ্বোধনী ভাষণ', 'আন্তর্জাতিকের সংবিধান', 'জেনিভা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য'—প্রতিটি রচনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে মার্কসের প্রত্যক্ষ আক্রমণ কোথাও বর্ষিত হয়নি। মার্কসের কাছে প্রাথমিক স্তরে এই সব তাত্ত্বিক গোঁড়ামির চেয়ে বড় ছিল শ্রমিক সংহতি। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের ভিতর বিভিন্ন মতবাদের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব শ্রমিক ঐক্য গড়ে ওঠার সুযোগ এসেছে। তাত্ত্বিক কঠোরতার আঘাতে কোনোমতেই এর ঐক্যে ফাটল ধরানো চলে না। বিভিন্ন মতের মধ্যে ক্রমাগত বিতর্কে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ আপন শ্রেণীর জন্য সঠিক পথটি একদিন বেছে নিতে পারবে। আন্তর্জাতিকের প্রাথমিক দায়িত্ব হোল শ্রমিক শ্রেণীকে একটি মাত্র সংহতির মধ্যে নিয়ে আসা ও বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। সঠিক শ্রেণীচেতনার প্রেরণায় ঐতিহাসিক মুহূর্তে শ্রেণীর যথাযথ সামাজিক ও রাজনৈতিক বোধ এই ঐক্যের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে। এঙ্গেলসকে লেখা এক চিঠিতে এ সম্পর্কে মার্কসের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল :

"The Committee of Action which the International Workingmen's Association called into being, the exchange of ideas by means of the different organs of the sections in all countries, and finally, the direct discussions at the General Congress will by degrees create for the worker's movement its common theoretical programme also."[১]

ব্রুসেলস কংগ্রেসে সাধারণভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।

১ Letter No. 122. Correspondence of K. Marx and F. Engels. 1945.

প্রস্তাবটির বয়ান ছিল, যে কোনো ধনতন্ত্রী দেশে যুদ্ধের মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণী তার সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে।

ব্রুসেলস কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার আগে মার্কসের 'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত (১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৭) হয়েছিল। আগের বছর লুসেনে কংগ্রেস চলা কালীন সময়ে ক্যাপিটাল প্রকাশিত হয়। এক বছর কেটে গিয়েছে, য়ুরোপের শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের হাতে ক্যাপিটাল এসে গিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে উপস্থিত কোনো শ্রমিক বা সমাজতন্ত্রী নেতা ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডে মার্কসের বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত হতে পারেননি। আন্তর্জাতিক থেকেই সকলের সমবেত সমর্থনে মার্কসকে সাধুবাদ জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল : "Karl Marx deserves the very great credit of being the first economist to have subjected capital to a scientific analysis."[১] প্রস্তাবটিতে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ক্যাপিটাল পড়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৃতীয় কংগ্রেসেও মার্কস উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আন্তর্জাতিকের কার্যবিধিতে মার্কসের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় কংগ্রেসে এক প্রস্তাবে কর্ষণযোগ্য ভূমির সামাজিক মালিকানার আদর্শ গৃহীত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল সমাজের সমস্ত সম্পদের উদ্ভব প্রাথমিক ভাবে ভূমি থেকে, অতএব সমাজতন্ত্রী অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা ব্যক্তিগত পর্যায়ে না রেখে সমবায় মালিকানায় কৃষক সমিতি গুলিকে অর্পণ করতে হবে। ফরাসী ও ফরাসীভাষী প্রতিনিধিদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়ে যায়।

চতুর্থ কংগ্রেস ঃ তৃতীয় কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউনসিলে প্রুধোঁপন্থীরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাখে। চতুর্থ কংগ্রেসে এই প্রতিবাদ দেখা দিল তুমুল বিতর্কের আকারে। ১৮৬৯-র সেপ্টেম্বরে Basle শহরে চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে জমির মালিকানার প্রস্তাব পুনরায় আলোচনার জন্য দুভাগে ভাগ করা হোল। জমিকে সাধারণ মালিকানায় আনার ব্যাপারে সমাজের অধিকার রয়েছে,

১ J. Braunthal

অপরটিতে বলা হোল জমিকে সাধারণ মালিকানায় আনার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

প্রস্তাবটি সুনির্দিষ্ট করার জন্য একটি কমিশন বসানো হয়েছিল। কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা অভিমত দিলেন সভ্যতার আদিতে জমি সাধারণ মালিকানায় ছিল—পরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নির্দয়ভাবে ব্যবহার করে জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। অতএব এই সামাজিক অন্যায় নিরাকরণের অধিকার সমাজের নিশ্চয় আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনায় বড় হয়ে দেখা দিল যে, সমাজের ওই অধিকার হয়তো আছে কিন্তু ওই পরিবর্তন বর্তমানে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিনা। শেষ পর্যন্ত মূল প্রস্তাবটির প্রথম অংশ ভোটের জোরে গৃহীত হোল।

পরে সাধারণ মালিকানাভুক্ত জমির পরিচালনা সংক্রান্ত প্রস্তাবে আবার বিতর্ক বেধে ওঠে। কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা অভিমত দিলেন যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার হাতেই পরিচালন ভার থাকবে। প্রুধোঁপন্থীরা চেয়েছিলেন সমবায়। জেনারেল কাউনসিলে মার্কসশিষ্য ইকেরিয়াস প্রস্তাবটি বিশদ করে উপস্থাপন করলেন। ইকেরিয়াস বললেন, সাধারণ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত জমিকে জমির চাষীদের সমবায়ের মধ্যে রেখে যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত করে তুলতে হবে—কিন্তু জেনারেল কাউনসিলে শেষ পর্যন্ত কোনো ঐক্যমত না হওয়াতে আলোচনা স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

বাকুনিন

Basle কংগ্রেসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মিখায়েল বাকুনিনের যোগদান। বাকুনিন রাশিয়ায় এক অভিজাত ভূস্বামীর সন্তান। বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের প্রবল সমর্থক। বাকুনিনের অনন্যসাধারণ চেহারা ও আচার-ব্যবহারে যেমন জনমুগ্ধকর ভঙ্গী আছে তেমনি বাকুনিনের চরিত্রে এক ভয়াবহ চক্রান্তকারী মন আর অকপট নিষ্ঠুরতাও ছিল। চল্লিশের দশকে য়ুরোপের যেখানেই বিপ্লবের আহ্বান এসেছে বাকুনিনকে বিপ্লবী জনতার সঙ্গী হিসেবে দেখা যেত। বিপ্লবের ধান্দায় বাকুনিন এক দেশ থেকে আর এক দেশে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। একবার প্রাশিয়ায় (১৮৫০) পরে অষ্ট্রিয়ায় ধরা পড়ে বাকুনিনের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। যেহেতু বাকুনিন জাতিতে রুশ, বাকুনিনকে ফাঁসির

দড়িতে ঝোলানো যায়নি। প্রাশিয়ার সরকার বাকুনিনের হাতে-পায়ে চেন বেঁধে অষ্ট্রিয়া সরকারের হাতে অর্পণ করে, কেন না অষ্ট্রিয়ায় বাকুনিন অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। অষ্ট্রিয়াও প্রবলপরাক্রান্ত রুশ সম্রাটকে চটাতে যায়নি, নতুন করে ফাঁসির শাস্তির পরোয়ানা ঝুলিয়ে চেনবদ্ধ বাকুনিনকে জারের হাতে প্রত্যর্পণ করা হোল। রাশিয়ায় জেলের ছোট কুটুরিতে দেয়ালের সঙ্গে চেন বেঁধে ছমাস বাকুনিনকে আটকে রাখা হয়েছিল। তারপর সাত বছর বাকুনিন রাশিয়ার বিভিন্ন দুর্গে ও শেষে সাইবেরিয়ায় নিঃসঙ্গ নির্বাসন জীবন যাপন করেছেন। ১৮৬১-র কোনো এক মুহূর্তে বাকুনিন সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। লণ্ডনে তিন বছর গোপনে কাটিয়ে ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডে বিপ্লবী প্রচারে নেমে গেলেন। ইতালির শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিরূপে বেল কংগ্রেসে যখন বাকুনিন এলেন এক রোমান্টিক মোহ বাকুনিনকে ঘিরে রয়েছে।

বেল কংগ্রেসে বাকুনিন এক প্ররোচক বক্তৃতায় উত্তরাধিকার স্বত্বের বিরোধিতা করলেন। বাকুনিন বললেন, এই উত্তরাধিকার থেকেই সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব। উত্তরাধিকার স্বত্বের বিলোপ সাধন ঘটলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-নির্ভর বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য। সামাজিক প্রথা থেকে উত্তরাধিকার স্বত্বের বিলোপে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও বিলোপ ঘটবে। সমাজ বিপ্লবের এটা পূর্ব শর্ত।

মার্কস বেল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু জেনারেল কাউনসিলের বক্তব্যের খসড়া ছিল মার্কস রচিত।

আন্তর্জাতিকের সম্পাদক হিসেবে ইকেরিয়াস তা উপস্থাপন করলেন। মার্কসের বক্তব্য ছিল যে, বর্তমানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তির মতই উত্তরাধিকারের স্বত্ব সমাজ ব্যবস্থার দান—উত্তরাধিকারের স্বত্ব থেকেই বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়নি। উত্তরাধিকার থেকে ক্রীতদাস পাওয়ার স্বত্বও ক্রীতদাস প্রথার জন্ম দেয়নি—ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল বলেই উত্তরাধিকার সূত্রে ক্রীতদাস লাভ করা যেত। সমাজ থেকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব তুলে নিলেই উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানার আওতা থেকে বেরিয়ে আসবে না। পক্ষান্তরে যদি উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয় সেটাই হবে উত্তরাধিকার স্বত্ব

বিলোপকরণের তুল্য। বিতর্কের পর কোনো পক্ষই ভোটের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। অতএব বাকুনিনের বক্তব্য যেমন গৃহীত হয়নি তেমনি বিরোধী পক্ষও বাকুনিনের প্রভাব খর্ব করতে পারেনি।

বাকুনিনের প্রভাব বৃদ্ধির সর্বনাশা দিকটি মার্কসের চোখ এড়াল না। বাকুনিনের কল্পনাশ্রয়ী লক্ষ্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বিশৃঙ্খল করে তুলবে। কেন না ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বাকুনিনের অদ্ভুত ধারণা ছিল। একটা সর্বক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বক্তি-স্বাধীনতা বিশেষ করে ক্ষুণ্ণ হয়—প্রুধোঁর মতই বাকুনিন তা বিশ্বাস করতেন। বাকুনিন বলতেন যতদিন বর্তমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম কানুন ও প্রতিষ্ঠান জিইয়ে থাকবে ততদিন শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে না। অতএব বাকুনিনের মতে যে কোনো রকম রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মীয় সঙ্ঘ, চার্চ, ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী কর্ম প্রতিষ্ঠান (civil service), সেনা-বাহিনী, পুলিশী ব্যবস্থা, ইত্যাকার সামাজিক কর্তৃত্ব ও শাসন ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে রাখে—পক্ষান্তরে শ্রমিক শ্রেণীর নিরঙ্কুশ অধিকারও ক্ষুণ্ণ করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, কি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও শোষণ ও নিপীড়নের সহায়ক।

এই সব শাসন ব্যবস্থার অর্থ কোনো বিশেষ বংশ, জাতি বা শ্রেণীর অধিপত্য কায়েম হওয়া। যে কোনো ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালিত হোক না কেন, তাতে তাবৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হলেও নিবিত্ত শ্রেণীর কাছে তা বন্দিশালা স্বরূপ। এমনকি কোনো কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের চেয়েও সর্বনাশা। বাকুনিন পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেছিলেন: "I want to abolish the state, my aim is the complete destruction of the very principle of state authority which up to now has meant the enslavement, suppression, exploitation and humiliation of mankind."[১]

সুতরাং সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনো প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর যোগদানের উপযোগিতা বাকুনিন মেনে নেননি। সংসদীয় নির্বাচনে, সমাজসংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপে কিংবা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর প্রভাব

১ J. Braunthal

বিস্তারে শ্রমিক শ্রেণীর সচেষ্ট হওয়া নিরর্থক। এই ধরনের কাজকর্ম তাঁর মতে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যবসিত হয়। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে বাকুনিন প্রত্যেকটি বিতর্কে বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। কিন্তু বিপ্লব বলতে বাকুনিন ব্লাঙ্কির ধারণাতেই আবদ্ধ ছিলেন। বাকুনিনের অর্থে বিপ্লব হোল যে কোনো রকম চক্রান্তে রাষ্ট্রযন্ত্র উল্টে দেওয়া। প্রুধোঁর নৈরাজ্যবাদী বিপ্লব-চেষ্টায় শক্তি প্রয়োগের স্থান নেই কিন্তু বাকুনিন-নৈরাজ্যবাদী নিরঙ্কুশ শক্তি প্রয়োগের সমর্থক।

বেল কংগ্রেসের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিকে মার্কসীয় চিন্তাধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো প্রুধোঁবাদ। বেল কংগ্রেসে বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ তৃতীয় চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটালো। মার্কসীয় বিপ্লববাদের আক্রমণের মুখে প্রুধোঁপন্থীরা আন্তর্জাতিকে ক্রমশই ক্ষীণশক্তি হতে শুরু করে— বেল কংগ্রেসে ভূমির সামাজিকীকরণ প্রস্তাবে প্রুধোঁপন্থীদের চরম পরাজয় ঘটে মার্কসপন্থীদের হাতে। ফ্রান্স বাদ দিলে য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা—ইংরেজ, জার্মান, জার্মানভাষী সুইস, বেলজিয়ান প্রমুখ সমাজতন্ত্রী নেতারা মার্কসীয় চিন্তাধারার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। প্রুধোঁপন্থীদের প্রধান ঘাঁটিতে বাকুনিনের প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। ইতালি ও স্পেনে বাকুনিনের অসামান্য প্রভাব ছিল—বেল কংগ্রেসেই বাকুনিন দক্ষিণ ফ্রান্সের ও ফরাসী সুইস প্রতিনিধিদের দলে টেনে নিতে সক্ষম হন।

মতবাদের ত্রিভুজাকার লড়াই শুরু হলেও বেল কংগ্রেসে দেখা গেল মার্কস-বাদের চূড়ান্ত জয়লাভ ঘটে গেছে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থন জুটেছে আর উৎপাদন ব্যবস্থার জাতীয়করণ স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু এতে অবশ্য মতবাদের লড়াই থেমে থাকেনি। আন্তর্জাতিকের পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যাবে মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদের লড়াই আরো বিস্তৃততর হয়েছে।

বেল কংগ্রেসের পর বাকুনিনপন্থীরা আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউনসিলে এবং বাইরে মার্কসের সরাসরি বিরোধিতা শুরু করেন। 'প্রাশিয়ান রয়্যাল সোস্যালিস্ট' এই নামের সংগঠন গড়ে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও লাসালীয়দের সঙ্গে বাকুনিনপন্থীরা যুক্ত হলেন। অপর দিকে মার্কসের বিরুদ্ধে প্রুধোঁ-মতাবলম্বীরাও ছিলেন। প্রুধোঁপন্থীদের সঙ্গে মার্কসের মতাদর্শগত বিরোধ বেধে গেল আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপার নিয়ে। আইরিশ

জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে মার্কস আন্তর্জাতিকের সমর্থন জানিয়েছিলেন। মার্কস দেখেছিলেন আয়র্লণ্ডের জাতীয় আন্দোলন সাফল্য লাভ করলে কেবল বৃটিশ ভূস্বামী শ্রেণী ও সামন্ততন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, সরাসরি ইংরেজ পুঁজিবাদীদের উপরও আঘাত এসে পড়বে। আয়র্লণ্ডের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতোমধ্যেই ইংরেজ শিল্প মালিকেরা আয়র্লণ্ডের শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ এনে দিয়েছে। আইরিশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দুটো পরস্পর বিরোধী দলের জন্ম হয়েছে। আয়র্লণ্ডে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মার্কস তাঁর জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্পর্কিত নীতি সমূহের প্রয়োগের সুযোগ পেলেন। অবশ্য ভারত ও চীন সম্পর্কিত আলোচনায় এক দশক আগেই এই সব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত মার্কস দিয়ে রেখেছিলেন। জাতীয় বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর যোগদান অবশ্য প্রয়োজনীয়— এই মতাদর্শের ভিত্তিতে মার্কসের সঙ্গে প্রুধোঁপন্থীদের বিরোধ। প্রুধোঁবাদীরা জাতীয় প্রশ্নকে বিবেচনার যোগ্য মনে করেন না। অপর পক্ষে মার্কস বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদের ধারণার সংকীর্ণতাও দেখিয়েছেন। মার্কসীয় মতে শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ দেশের সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ পররাজ্যলোলুপ হয়ে উঠবে না উপরন্তু দেশ-বিদেশের শ্রমিক ও নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে অটুট সৌভ্রাত্রের বন্ধনে বাঁধা থাকবে।

ইতোমধ্যে ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ বেধে গেল। মার্কস আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউনসিলে যুদ্ধের চরিত্র বিচার করে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। জার্মানীর বিরুদ্ধে লুই বোনাপার্টের এই যুদ্ধকে মার্কস লুণ্ঠনকারীদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করলেন। ১৮৫১-র কু-দ্যে-তায় (coup-de-'etat) লুই বোনাপার্ট ফ্রান্সের অধিকর্তা হয়ে বসেন। বোনাপার্ট হলেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।

প্যারী কমিউন

১৮৪৮-র ব্যর্থ বিপ্লবে ফ্রান্সের ধনতান্ত্রিক শক্তি ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক শক্তির রাষ্ট্রক্ষমতা না থাকলেও তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন কালে ফ্রান্সের শিল্পোন্নতি ঘটে। রাইনের উপর ফ্রান্সের দখল বিস্তারিত করার জন্যে

নেপোলিয়নের প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাঁর পতনের কারণ হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটলো—সম্রাট পলাতক হলেন।

ফ্রান্সে নতুন সরকার গঠিত হোল—"গভর্নমেণ্ট অব ন্যাশানাল ডিফেন্স"। প্যারিসের শ্রমজীবী শ্রেণী প্যারিস রক্ষার জন্য সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসেন। শ্রমিক শ্রেণীর এই অভ্যুত্থানে তথাকথিত জাতীয় প্রতিরোধের সরকার আশঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগঠন নিরস্ত্র করার কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। জাতীয় সরকার সংগ্রামী প্রতিরোধকামী জনতার সাহায্য নিয়ে হঠাৎ বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে প্রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভার্সাই নগরীতে আর এক নতুন সরকার গঠিত হোল। প্যারিসের সংগ্রামী মানুষেরা এই সরকারকে মেনে নিতে পারলো না, ফলে নতুন সরকারের সঙ্গে প্যারিসের শ্রমিকদের যুদ্ধ বেধে গেল। শ্রমিকদের সংগ্রামী কমিউন তৈরী হোল প্যারিসে। ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা তখন সবে নতুন সরকারের দখল পেয়েছে। প্রাশিয়ার রাজশক্তির সহায়তায় ফ্রান্সের সরকার প্যারীর শ্রমিক সংগঠনগুলি ভাঙার জন্যে এগিয়ে এল। প্যারী কমিউনের বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য রাজনৈতিক শক্তির সর্বোত্তম ঘাঁটি হোল কমিউন। বিপ্লবের সময়ে কমিউনগুলিই হোল সংগ্রামী মানুষের রাজনৈতিক শক্তির উৎস। প্যারী কমিউনের বিশ্লেষণ করে এর দুর্বল স্থানগুলিও মার্কস দেখিয়েছেন।

প্যারিসের শ্রমিকদের এই বিদ্রোহের কাহিনী ইংলণ্ডে পৌছুতেই মার্কস তৎপর হয়ে উঠলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক সংগঠনগুলির কেন্দ্রে, আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন দেশের শাখা অফিসে এই বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে মার্কস শতাধিক পত্র পাঠালেন—প্রতি পত্রেই ফরাসী বিপ্লবের সমর্থনে দেশে দেশে আন্দোলন গড়ার নির্দেশ ছিল। ফরাসী কমিউনার্ডদের চিঠি মারফৎ গোপন যোগাযোগ রেখে মার্কস এঙ্গেলসের সহযোগিতায় গোপন নির্দেশ পাঠাতে শুরু করলেন কিন্তু সকল সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠু ছিল না—প্যারিস শহর প্রায় অবরুদ্ধ হয়েছিল। এছাড়াও মার্কসের পরামর্শ ও নির্দেশ উপেক্ষা করার মত শ্রমিক নেতার অভাব ছিল না—কমুনার্ডদের মধ্যে ব্লাঙ্কি ও প্রুধোঁ মতাবলম্বীরাও ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফান্সের শ্রমিকদের এই প্রতিরোধ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অবশ্য বিদেশী শক্তির সহায়তায় ফ্রান্সের নতুন

রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী বুর্জোয়া শক্তি কমিউনার্ডদের সকল বিপ্লবী চেষ্টা চুরমার করে দেয়।

'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারে' মার্কস বলেছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের এর পরের ধাপটি হোল ফ্রান্সের মিলিটারী ও আমলাতন্ত্রের অধিকারে যে রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে উঠেছে তার হাতবদল নয়, তার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনই হবে শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য। ফ্রান্সের এই ঘটনা মার্কসের ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ ভ্রান্তিহীন প্রমাণ করেছে কেন না কমিউনার্ডদের পরাজয়ের পর বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে যে রাষ্ট্রযন্ত্র এল তাতে শ্রমিক ও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোল না। যার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন ছিল কাম্য তার হাতবদল হোল।

অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারে মার্কস দেখিয়েছেন ফরাসী কৃষকশ্রেণীর বিপ্লববিরোধী সক্রিয়তা তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে কৃষক সমাজের শ্রেণীগত কোনো লাভ হয়নি কিন্তু সমাজে প্রতিবিপ্লবের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনের পরাজয়ের কয়েকদিন পরেই মার্কস তার 'দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স' পুস্তকটি অতি দ্রুত রচনা করে ফেললেন। ফ্রান্সের সমকালীন বিপ্লবের নিখুঁত বর্ণনা এই রচনাতে বর্ণিত হয়েছে। বিপ্লবের সময়ে কৃষকের সঙ্গে শ্রমিকের সংগ্রামী মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। প্যারী কমিউনের বিশ্লেষণ দিয়ে মার্কস বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য রাজনৈতিক শক্তির সর্বোত্তম ঘাঁটি হোল কমিউন। বিপ্লবের সময়ে কমিউনগুলিই হবে সংগ্রামী মানুষের রাজনৈতিক শক্তির উৎস। মার্কস দেখিয়েছেন যে, প্যারী কমিউনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রথম যথার্থ শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। এর আগের বিপ্লবগুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্র এক শ্রেণীর অধিকার থেকে আরেক শ্রেণীর অধিকারে এসেছে কিন্তু কমিউনগুলির লক্ষ্য হবে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দেওয়া, কেন না পুরনো রাষ্ট্রিক কাঠামো শ্রমিক ও নিপীড়িত শ্রেণীর পীড়নের যন্ত্র মাত্র। কমিউনগুলির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিশদ ভাবে বলতে গিয়ে মার্কস শ্রমিক রাষ্ট্রে নির্বিত্ত শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার (Dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বিশদ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এতদিন মার্কসীয় বিশ্লেষণে যা তাত্ত্বিক আকারে ইঙ্গিতে বর্ণিত ছিল প্যারী কমিউনের কার্যাবলীতে তা প্রত্যক্ষ

সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই রচনায় মার্কস আরো বিশদ করে দেখিয়েছেন যে, কমিউনগুলি কেবল নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলবে না— স্বল্পবিত্ত কৃষক ও শহুরে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাও কমিউনগুলির মারফৎ হওয়া সম্ভব।

'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকটি বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের নিকট আন্তর্জাতিকের আবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্রান্সে কমিউনের পতনের পর দেশে দেশে মার্কসের রচনা মারফৎ কমিউনের রাজনৈতিক দর্শন শ্রমিক আন্দোলনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কমিউন সম্পর্কিত এই প্রচার দেশ বিদেশের সরকার সুনজরে দেখেনি— সরকারগুলির আশঙ্কার কারণ অহেতুক ছিল না। এমনকি আন্তর্জাতিকের মধ্যেও বিভেদের সৃষ্টি হোল। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ওজার (Odger) ও লুক্রাফট্ (Lucraft) আন্তর্জাতিকের আবেদন হিসেবে প্রচারিত 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' থেকে তাঁদের স্বাক্ষর তুলে নিলেন।

এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসের চরম বিরোধী ছিলেন বাকুনিন-পন্থীরা। বাকুনিনপন্থীরা শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গঠনের বিরোধী। সন্ত্রাসবাদী নৈরাজ্যে তাঁদের আস্থা। লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের কনফারেন্সে (১৮৭১) মার্কস প্যারী কমিউনের প্রসঙ্গ তুলে দেখান যে, প্যারিসে সংগ্রামী মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার মত একটি কেন্দ্রীয় দল থাকলে কমিউনগুলির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতো না—সংযোগকারী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে কমিউনার্ডরা পরাজিত হয়েছেন। কনফারেন্সে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়— ঠিক এই প্রস্তাবটিই বাকুনিনপন্থীদের কাম্য ছিল না।

পঞ্চম কংগ্রেস ঃ হেগ শহরে আন্তর্জাতিকের পরবর্তী কংগ্রেসে (১৮৭২) বাকুনিনবাদীদের সঙ্গে বিরোধ চরমে ওঠে। এই কংগ্রেসে মার্কস বাকুনিন-বাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। বাকুনিনের অনুগামীরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী হলেও সুবিধাবাদী বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলতেন—যাঁরা কোনো রকম সন্ত্রাসবাদী ও নৈরাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপে কোনো দিনও সমর্থন জানাননি। এই কংগ্রেসে বাকুনিনপন্থীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। আন্তর্জাতিকের এক বিশেষ প্রস্তাবে মারাত্মক বিভেদপন্থী

কার্যকলাপের জন্য বাকুনিন ও গিলম (Guillaume) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত হলেন।

হেগ শহরেই আন্তর্জাতিকের শেষ কংগ্রেস বসে। মার্কস ও এঙ্গেলসের নেতৃত্ব আন্তর্জাতিককে বিশেষ গৌরবের আসনে বসিয়েছে। সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার আট বছরের ইতিহাস এখনও গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করেন। আন্তর্জাতিকের মারফৎই মার্কসীয় চিন্তার প্রভাব বিশ্বের গণ-আন্দোলনে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে—মার্কসের রচনা বহুল প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছে। আন্তর্জাতিকের শেষ পর্যায়ের যথাযথ বিবরণ লেনিনের রচনা থেকে পাওয়া যাবে : "The worker of Britain corrupted by imperialist profits, the Commune defeated in Paris, the recent triumph of the bourgeois national movement in Germany, the agelong sleep of semi-feudal Russia, Marx and Engels gauged the times accurately ; they understood the international situation ; they understood that the approach to the beginning of the social revolution must be slow."[১]

প্যারী কমিউনের পর দেশে দেশে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতি সরকার ও পুলিশের দৃষ্টি প্রখরতর হয়, কোথাও কোথাও নিপীড়নও শুরু হয়। বিভেদপন্থী কাজে বাকুনিনবাদীরাও তৎপর হয়ে ওঠে। মার্কস দেখলেন পরিবর্তিত অবস্থায় আন্তর্জাতিকের পুরনো সংগঠনের মারফৎ কাজ করা যাবে না। পুরনো সংগঠনটি যথাযথ ভাবে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিতে পেরেছে—শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ চেতনার প্রসার ঘটাতে পেরেছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণায় এই মুহূর্তে সবিশেষ প্রয়োজন বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় দল গঠনের। প্যারী কমিউনের শিক্ষা থেকে এই দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পেয়েছে। মার্কসীয় তত্ত্ব এই সব দলের নীতি নির্ধারণে হাতিয়ার হবার মত বহুল প্রচার আন্তর্জাতিকের মারফৎ পেয়ে গেছে। তবু বাকুনিনপন্থীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য মার্কস আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলের অফিস

১ V. I. Lenin : Collected Works, Vol. 24, p. 86

নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজস্ব শ্রমিক দল গড়ে ওঠার জন্য আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে আসতে থাকে—আন্তর্জাতিকের গুরুত্বও কমতে থাকে। জেনিভায় ১৮৭৩ সালের কংগ্রেসে খুব স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দেন। ১৮৭৬ সালে আন্তর্জাতিক সংগঠনটির মৃত্যু ঘটে।

অন্তিম লগ্ন

আন্তর্জাতিকের জন্য মার্কসের পরিশ্রমের শেষ ছিল না। মার্কসের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ক্রমাগত বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলে। প্রতিদিন তের ঘন্টা কাজের মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না, ওই অবস্থায় কোনো কোনো সময়ে মার্কস রাত জেগেও কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিকের আলোচনা সভা, ছোট ছোট পুস্তিকা (pamphlet) রচনা, নীতিগত বিতর্কে যোগদান, দেশে-বিদেশে বন্ধু ও শিষ্যদের চিঠি লেখা, এসব ছিল নিত্যকার কাজ। এর সঙ্গে ছিল ক্যাপিটালের শেষ খণ্ড দুটির রচনা ও তথ্য সংগ্রহ। চিকিৎসক বন্ধুদের বিশেষ অনুগ্রহে ও যত্নে অটুট মনোবলে মার্কস কাজ করে চলেছেন। বিশ্বের সব দেশের সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে মার্কসের যোগাযোগ ছিল। অনেকেই সময় করে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য আসতেন। কাজের মধ্যে এমনই ডুবে থাকতেন যে অনেক সময়ে দুপুরের আহারের কথা মনে পড়তো না। ব্ল্যাক কফি আর সিগার এ দুটি উত্তেজক নেশায় মার্কস কাজ করে যেতেন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পাঠের মাঝে মাঝে একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে মার্কস বিভিন্ন দেশের ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে ডুবে যেতেন। কখনো কখনো তৎকালীন গণিতের চর্চায়ও মন দিতেন। বিজ্ঞান সম্পর্কিত অগ্রগতির ইতিহাস, রসায়ন, জীব-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহে মন দিতেন, এমনকি 'ইনফিনিটেসিম্যাল ক্যালকুলাসে'র একটি ছোট আলোচনাও মার্কস রচনা করে রেখেছিলেন। এই সময়কার মার্কসের বর্ণনায় পল লাফার্গ লিখছেন: "His brain was like a man-of-war in port under steam, ready to launch into any sphere of thought."[১] লাফার্গ আরো বলেছেন, মার্কসের ক্যাপিটাল তাঁর তুলনাহীন পাণ্ডিত্যের প্রকাশ কিন্তু মার্কসের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন তাঁরা জানেন মার্কসের কোনো রচনা, কোনো সৃষ্টিই তাঁর অতি-উত্তুঙ্গ মনীষার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারেনি।

---

১ Paul Lafargue—*Reminiscences of Marx and Engels*, p. 77

শেষের দিকে আন্তর্জাতিকের কার্যসূচী প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও শ্রমিকনেতা হিসেবে মার্কসের প্রভাব বিশ্বের রাজনীতিতে ক্রমপ্রসারিত ছিল। এই প্রভাব দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমতালে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দেশ বিদেশের শ্রমিক শ্রেণীর নতুন পার্টিগুলিতে মার্কসের স্থায়ী আসন ছিল। বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর দলগঠন সমস্যার ব্যাপারে মার্কসকে মাথা ঘামাতে হোত। সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উপাদান আর বাকুনিনবাদীদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত একটি সাধারণ আলোচনা 'অ্যালায়েন্স অব সোসালিস্ট ডেমোক্র্যাসী' পুস্তিকাটি মার্কস এঙ্গেলসের সহযোগে রচনা করলেন। এই সময়কার উদীয়মান শ্রমিক আন্দোলনের সর্বপ্রধান সমস্যা—একতা। কোথাও বাকুনিন, কোথাও লাসাল, কোথাও প্রুধোঁর অনুগামীরা শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ সংগ্রামী চেতনায় অনেক বিভেদের সৃষ্টি করেছে।

জার্মানীতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারে প্রধান বাধা ছিল লাসালীয় মতাদর্শ। এমনকি লাইবনেকৃটের মত শ্রমিক নেতাও লাসালীয় মতানুগামীদের প্রভাব এড়াতে পারেননি। জার্মানীর গোথা (Gotha) অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর এক ঐক্যবিধায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যসূচীর উপর লাসালের প্রভাব পড়ে। মার্কস এই কার্যসূচীর এক চূড়ান্ত সমালোচনা করে রচনা করলেন, Zur Kritik des Sozial-demokratischen Partei programme (1875)—'গোথা কার্যসূচীর সমালোচনা'। মার্কসের শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। মার্কস এই রচনায় একাধিক নতুন ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমকালীন সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। অনেক দূর চিন্তা করে মার্কস সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী এবং সাম্যবাদী সমাজের মৌল উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দ মার্কসের এই রচনা সেদিন গোপন করে রেখেছিলেন। মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজ-পত্র থেকে এর কপি উদ্ধার করে এঙ্গেলস ১৮৯১ সালে রচনাটির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশে সহায়তা করেন।

'গোথা প্রোগ্রাম' নামে অভিহিত মূল খসড়া কার্যসূচীতে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মিলিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরী করার চেষ্টা হয়েছিল।

ওই মূল কার্যসূচীর সমালোচনায় মার্কস শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন :

১ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সমাজতন্ত্র রচনার পথে বাস্তব উপকরণ তৈরী করে রাখে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পণ্য এবং উৎপাদনের বণ্টন ব্যবস্থার উপায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির কল্যাণে জানা হয়ে যায়।

সাম্যবাদের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রে বিনিময় ও বণ্টনের লক্ষ্য "From each according to his ability, to each according to his labour." এই ব্যবস্থা থেকেই সাম্যবাদী সমাজের দিকে পা বাড়ানো সম্ভব হবে। তখন সমাজের নীতি হবে "From each according to his ability, to each according to his need."

২ তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে বহুল প্রচারিত শ্লোগান ছিল : 'শ্রমের মূল্যের সন্তোষজনক বণ্টন'। মার্কস এই শ্লোগানের বিরোধিতা করেছেন। কেন না শ্রমের মূল্য সকল সময়ে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী বণ্টিত হয়ে থাকে। সন্তোষজনক বণ্টনের নামে অতি সাধারণ সংস্কারজনিত পরিবর্তন শ্রমজীবী মানুষের বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের অনুকূলে যাবে না। ঠিক এই সূত্রেই আর একটি জনপ্রিয় শ্লোগানের সমালোচনা মার্কস করেছেন— "গণতান্ত্রিক সরকারের সহায়তা"। মার্কস বলছেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার গঠন শেষ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হোল প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলেই শ্রমজীবী শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তনের সুযোগ ঘটবে।

৩ আর একটি বহুল প্রচারিত ধারণাকে মার্কস আঘাত দিয়েছেন। মার্কস বলেছেন একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী ব্যতীত অপর সমস্ত শ্রেণীই প্রতিক্রিয়াশীল এই ধরনের বক্তব্য সুবিধাবাদীদের শ্লোগান। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বা সন্ধিক্ষণে সমস্ত সামাজিক শ্রেণীর চরিত্র বিচার করা উচিত। সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশে বিশেষ বিশেষ

সামাজিক শ্রেণীর যথাযথ ভূমিকা জানা দরকার। সময় ও ঘটনা বিশেষে শ্রমজীবী শ্রেণীকে পুঁজিবাদী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামতে হয়। সেক্ষেত্রে শ্রেণীগুলির স্বার্থের বিভিন্নতা থাকলে সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৪ গোথার কার্যসূচীর খসড়ায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ স্থান পেয়েছে—মার্কস এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রাম ও ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন।

৫ মার্কস তৎকালীন প্রচলিত মুক্ত রাষ্ট্রের (Free State) বিরুদ্ধতা করেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যবর্তী অবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনশীল অবস্থার উদ্ভব ঘটে। এই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন হয় যখন নির্বিত্ত শ্রেণী নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়। গোথা কার্যক্রমের সমালোচনায় সাম্যবাদের শেষ পর্যায়ের বর্ণনা দিয়ে মার্কস বলছেন: "সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে মানুষ দৈনিক শ্রম-বিভাজনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবে, প্রচলিত সমাজে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তাও ঘুচবে, সহযোগিতা ও সমবায়ের ভিত্তিতে শ্রমদানের ব্যবস্থায় উৎপাদনী প্রথার সর্বব্যাপক উন্নতির মধ্যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটা সম্ভব—তখনই সমাজের নতুন শ্লোগান উচ্চারিত হবে: 'সাধ্য অনুসারে শ্রমদান, প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ গ্রহণ'।

এই রচনায় মার্কস রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর বৈপ্লবিক মতাদর্শের শেষ কথা বলেছেন। প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাজাত পরিস্থিতিতে ইতিহাসের অগ্রগতির নিয়মে সাম্যবাদী সমাজের ভবিষ্যৎ কাঠামোর রূপরেখা রচনা করেছেন।

১৮৭৭ সাল থেকে বোঝা যেতে লাগলো মার্কসের কর্মশক্তি ফুরিয়ে আসছে। মার্কসের জীবনের শেষ পর্যায় কেটেছে লণ্ডনের মেটল্যাণ্ড পার্ক রোডের বাড়িতে। মার্কসের কন্যারা বড় হয়ে উঠেছেন। দুই কন্যা জীবিত। ইলিনর ও জেনী। দুজনেই বিবাহিত। মার্কসের বাড়িতেই দুজনের সংসার। ইলিনর মার্কসের সেক্রেটারী রূপে কাজ করেন—তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের

নেত্রী। মার্কসের শেষ দিকের প্রিয় সঙ্গী ছিলেন ভিলহেলম লাইবনেকৃট। লাইবনেকৃট জার্মান 'রাইখস্টাগে'র নির্বাচিত সদস্য। জার্মানীর পার্টি-জার্নালের সম্পাদক। লাইবনেকৃট মাঝে মাঝে লণ্ডনের বাড়িতে এসে মার্কসের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। আরেক জন ছিলেন মার্কসের প্রিয় পাত্র—এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন। 'সোস্থাল ডেমোক্র্যাট' পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক।

এঙ্গেলস, বার্নস্টাইন, মার্কস তিন জনে বসে তখনো পরিকল্পনা করতেন 'সোস্থাল ডেমোক্র্যাটে'র চেয়েও তত্ত্বগত দিক্ দিয়ে উন্নততর পত্রিকার সম্ভাবনার কথা। কিন্তু ওই আলোচনা পর্যন্তই কাজ এগোনো। নতুন করে পত্রিকার জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা মার্কস এঙ্গেলসের ছিল না, বয়সের ভারে দুজনেরই কর্মশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিশেষ করে মার্কসের। সারা জীবন অমানুষিক পরিশ্রম, স্বল্পাহার, রোগভোগ ৫৯ বছর বয়সেই (১৮৭৭) মার্কসকে প্রায় অক্ষম করে তোলে। মার্কসের আগেই স্ত্রী জেনী শয্যা নিলেন। শেষ শয্যা। প্লুরিসিতে আক্রান্ত। ওই রুগ্ন অবস্থাতেই জেনী সংসারের কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করে যেতেন। ইলিনরের স্মৃতিকথা থেকে এই সময়ের মার্কস পরিবারের কাহিনী জানা যায়: "সামনের বড় ঘরে মা শুয়ে রয়েছেন, পরের ঘরে রয়েছেন পিতৃদেব (মুর)[১]। যে দুজন সারা জীবন একত্রে কাটিয়েছেন, একজনের কাছে অন্যজন চিরকালই অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় ছিলেন—অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা ছিলেন—আজ দুজনে একঘরে দিন কাটাতে পারেন না। মুর আবার রোগে শয্যাশায়ী। আমি সেদিনের কথা ভুলবো না যেদিন তিনি রুগ্নদেহ উপেক্ষা করে মনের অমিত শক্তি সঞ্চয়ে মার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মনে হোল ওঁরা দুজন বুঝি যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে গেছেন…"[২]

জেনী মার্কস মারা গেলেন ১৮৮১, ২রা ডিসেম্বর। এর পরে মার্কস আরো পনের মাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু শেষ আঘাত এলো প্যারিস শহরে কন্যা জেনীর মৃত্যু সংবাদে। অক্ষম মার্কসের বিপর্যস্ত অবস্থা। ডাস ক্যাপিটালের শেষ দু খণ্ডের তখনো ছাপার জন্য কপি তৈরী করে উঠতে পারেননি। শারীরিক ক্ষমতায় তখন তা সম্ভব ছিল না। জীবনের প্রিয়তম সঙ্গী সুহৃৎ মার্কসের

১ মার্কস আত্মীয় পরিজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহলে 'মুর' নামে পরিচিত ছিলেন।

২ John Lewis : *The Life and Teaching of Karl Marx.* p. 271

ওই আকৃতি দেখেছেন, দেখেছেন জীবনের শেষ দৃশ্যটিও। সর্জকে (Sorge) লেখা এক পত্রে এঙ্গেলসের জীবনের বিষণ্ণতম উক্তিগুলি উদ্ধৃত আছে: "জীবনের শেষ ছটি সপ্তাহের প্রতিদিন বাড়ির নিকটতম মোড়ের কাছে এসে আমি আশঙ্কায় উদ্বেল হয়ে উঠতুম, হয়তো দেখবো আজই যবনিকা টানা হয়ে গেছে। গতকাল (১৮৮৩, ১৪ই মার্চ) দুপুর ২টা বেজে ৩০ মিনিট—এটাই তাঁকে দেখার সর্বোত্তম সময়—বাড়িতে পৌছলুম যখন, দেখি সবার চোখে জল। সান্ত্বনা দেওয়ার অছিলায় কী হয়েছে জিজ্ঞেস করি। দৃষ্টির সামনে সামান্য রক্তক্ষরণ হতে দেখলুম—কিন্তু পরক্ষণেই অতিক্রত সব শেষ।" এঙ্গেলস আরো বলছেন, 'মানুষের সংখ্যা থেকে গুণতিতে একজন কমলো, এই একজনই একালের সর্বোত্তম।'

পরিশিষ্ট—১

ডাস ক্যাপিটাল

সমাজপ্রগতির সাধারণ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই মার্কসীয় অর্থনীতি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। সামাজিক ইতিহাস ব্যাখ্যায় মার্কস দেখিয়েছেন, যে কোনো ঐতিহাসিক যুগ সমকালীন পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার (mode of production) দ্বারা মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে মার্কস সাধারণ ভাবে উৎপাদন পদ্ধতির প্রসঙ্গ তোলেননি। মার্কস জোর দিয়েছেন উৎপাদন সম্পর্কের উপর—যার অর্থ, উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর ক'রে সামাজিক মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যে ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে বা সামাজিক আসন লাভ করে। যেমন, মধ্যযুগে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে প্রধানতম হোল সামন্ত-জমিদার ও ভূমিদাসের মধ্যকার সম্পর্ক। প্রাচীন যুগে ছিল প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্পর্ক। এই সব পারস্পরিক সম্পর্কগুলির মধ্যে লক্ষণীয় যে, প্রভুশ্রেণী কেবল মাত্র উৎপাদনের যন্ত্র ও তজ্জাত উৎপাদনী পণ্যের অধিকারী হন না, উৎপাদক শ্রেণীটিকেও প্রভুশ্রেণীর অস্থাবর সম্পত্তির সামিল হতে হয়। কেবল মাত্র পুঁজিবাদী সমাজেই উৎপাদক শ্রমজীবীর সঙ্গে প্রভু বা পুঁজিপতির পূর্বেকার আইনগত বন্ধন ছিন্ন হতে দেখা যায়।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক-মালিকের শর্তসাপেক্ষ চুক্তির বন্ধন এসেছে। আইনের চোখে শ্রমজীবী মানুষ মালিকের মতই স্বাধীন, মুক্ত মানুষ। এই সমাজে পুঁজিপতিকে শ্রমদান বাধ্যতামূলক নয়—পুঁজিপতিকে শ্রমজীবী দৈহিক শ্রম বিক্রি করে মাত্র। এই শ্রম বিক্রয়ের ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সমাজের চেহারা পূর্বেকার সমাজের কাঠামোকে আমূল বদলে দিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই উপরকার চেহারা দেখে মনে হতে পারে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে চুক্তির শর্তসাপেক্ষে সমাজে যে স্বাধীন সম্পর্কের সূচনা হয়েছে তার মধ্যে পূর্বেকার মত শোষণের সম্পর্কও বুঝি আর নেই।

সমাজ বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি থেকেই মার্কস অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে তাঁর সমকালীন বা পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন পথ নিয়েছেন। মার্কসের আর্থিক

বিশ্লেষণের মূলে রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাবজাত সামাজিক সম্পর্ক ও সমকালীন আর্থিক ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যমে যে চুক্তির বন্ধন তজ্জাত ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় যে অসংগতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব—তারই বিশ্লেষণ। অন্যান্য অর্থনীতিবিদ্‌দের মতই মার্কস পণ্যমূল্য (Prices), বিনিময় (Exchange), মূল্যমান (Value) ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনায় এসেছেন কিন্তু মার্কস মনে করেন কেবলমাত্র সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের পটভূমিকায় এই সব আর্থনীতিক সংজ্ঞার সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভব।

ক্যাপিট্যালের প্রথম খণ্ডে, মার্কস শুরু করেছেন পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন প্রণালীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ দিয়ে। ধনতান্ত্রিক সমাজে বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্য-দ্রব্যের দুটি চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। একটিতে তার ব্যাবহারিক মূল্য প্রকাশ পায়, অপরটিতে বিনিময় মূল্য। পণ্যের ব্যবহার্য দিক্ বা চাহিদা পূরণের ক্ষমতা থাকে বলেই পণ্যের একটি বিনিময় মূল্য বা বাজার দর থাকে। অতএব পণ্যদ্রব্য দুটি অবস্থায় প্রকাশমান : ব্যাবহারিক মূল্য ও বাজার দর। পণ্যের ব্যাবহারিক মূল্য যাই হোক না কেন, বাজার দর দিয়েই পণ্য যাচাই হয়ে থাকে, একটি পণ্য দিয়ে অপর পণ্যেরও মূল্য যাচাই করা যেতে পারে, যেমন, ধরা যাক :

পাঁচ গজ কাপড়=একটি কোট

এখানে কোট, এই পণ্যদ্রব্য দিয়ে পাঁচ গজ কাপড়ের মূল্য বা বাজার দর নিরূপিত হচ্ছে। এই মূল্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কাপড়ের আপেক্ষিক মূল্যের (relative value) সন্ধান পাওয়া যায়। একটি কোট এখানে পাঁচ গজ কাপড়ের তুল্য বস্তু। এই ভাবে একাধিক পণ্যবস্তু পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। যেমন,

৫ গজ কাপড়=১ কোট=১০ পাউণ্ড চা=৪ পাউণ্ড কফি।

অতএব যে কোনো পণ্য একাধিক অন্যান্য পণ্যের পরিমাণ দিয়ে বিনিময়-যোগ্য হতে পারে, তুলনীয় হতে পারে। এই ভাবে যে কোনো একটি পণ্য সারা বিশ্বের পণ্যবস্তুর সঙ্গে একটি সামাজিক সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে যায়।

এখানে একটি কোট, পাঁচ গজ কাপড় কিংবা দশ পাউণ্ড চা বা চার পাউণ্ড কফির সঙ্গে বিনিময়যোগ্য। যখন একটি মাত্র পণ্য বিভিন্ন পণ্যের পরিবর্ত

হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন সেই বিশেষ পণ্যটি সকল পণ্যের তুল্য বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং সেই বিশেষ পণ্যটিকে মুদ্রা বলা যেতে পারে।

একটি সাধারণ তুল্য বস্তু দিয়ে প্রতিটি পণ্যের বাজার দর স্থিরীকৃত হয়—সেই সাধারণ তুল্য বস্তু অর্থাৎ মুদ্রা মূল্যমানের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু পণ্যের প্রকৃত মূল্য তার উৎপাদনের শ্রম-সময়ের (labour time) মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু উৎপাদনের শ্রম-সময় দিয়ে পণ্যের বাজার দর যাচাই হয় না—হয় মুদ্রা দিয়ে। সুতরাং পণ্যের প্রকৃত মূল্য বা মূল্যমান (Value) যা পণ্যের উৎপাদনের শ্রম-সময় দিয়ে যাচাই হওয়া উচিত, ব্যাবহারিক জগতে তা হয়ে থাকে বাজার দরের সাহায্যে, উৎপাদনের শ্রম-সময় সেখানে স্বীকৃতি পায় না, বাজার দরের জন্য সেখানে স্বীকৃতি পায় মুদ্রা। দেখা যায় বাজার দরের ওঠা-নামা কম বেশি হলেও পণ্যের অন্তর্নিহিত বা ব্যাবহারিক মূল্য কিন্তু একই থাকে। পক্ষান্তরে বাজার দরের নড়চড় ঘটলেও পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের নড়চড় হয় না— তার পরিমাণ একই থেকে যায়। অতএব ব্যাবহারিক বা অন্তর্নিহিত মূল্যের বদল না হলেও পণ্যের বাজার দরের বদল ঘটতে পারে। পণ্যের বিনিময়ের ব্যাপারে বাজার দর মুদ্রার দ্বারা পরিমিত হয় সুতরাং মুদ্রা দিয়ে পণ্যের ব্যাবহারিক বা অন্তর্নিহিত মূল্যের পরিমাপ হয় না। এই বক্তব্যের উপরেই মার্কসের শ্রম-মূল্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

মার্কসের মতে, বাজারে পণ্যের বিনিময়ের সরল সংক্ষিপ্ততম রূপ নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশযোগ্য : প— ম— প অর্থাৎ পণ্য— মুদ্রা—পণ্য।

উৎপাদক তার পণ্যকে বাজারে নিয়ে আসে, মুদ্রার বিনিময়ে ক্রেতা পণ্যটি ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিনিময়ের সমগ্র পদ্ধতি এখানে সরল ও সংক্ষিপ্ত আকারে এই ভাবে বলা যায় যে, পণ্যটি বিনিময়ের সঠিক মুহূর্তে ক্রেতার কাছে মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং বিনিময়ের পর নতুন পণ্যটি ভোগ্য বস্তু হিসেবে ব্যাবহারিক কাজে বা ক্রেতার ভোগে লাগে। সুতরাং বিনিময় ব্যাপারটি আসলে পণ্য থেকে মুদ্রা ও মুদ্রা থেকে পণ্যে পরিণতি লাভ করে।

এই ধরনের বিনিময়ের সারল্য দেখা যায় যখন বিক্রেতা নিজেই উৎপাদক। স্ব-উৎপাদনের পণ্য কারিগর বা চাষী নিজেই বাজারে নিয়ে যায়—নিজেই

পণ্যের প্রাথমিক বিনিময়ের কার্যটি সম্পন্ন করে। কিন্তু ধনতন্ত্রের যুগে বিনিময় ব্যাপারটি এত সরল থাকে না কারণ ধনতন্ত্রের যুগে কারিগর উৎপাদনের অধিকারী নয়—কারিগর কেবল উৎপাদনের জন্য শ্রম দিয়েই খালাস। শ্রমের বিনিময়ে কিছু মুদ্রা প্রাপ্তি ঘটে শ্রমের মূল্য হিসেবে কিন্তু শ্রমজাত পণ্যের মালিক কারিগর হয় না—উৎপাদন যন্ত্র বা পুঁজির যে মালিক তিনিই শ্রমিকের শ্রমজাত পণ্যের মালিক। তিনিই উৎপাদিত পণ্যটি বাজারে নিয়ে যান—বিনিময়ে মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক পণ্য বেচে না, বেচে তার শ্রম—সেই শ্রমের পরিমাপ হয় মুদ্রায়।

ঠিক এই অবস্থায় বিনিময়ের রূপটি বদলে গিয়ে দাঁড়ায় মুদ্রা— পণ্য—মুদ্রা বা ম— প— ম', অর্থাৎ পণ্যটি বাজারে আসার আগে পুঁজির মালিক তাঁর অর্থ সম্পদ বা মুদ্রা ব্যয় ক'রে পণ্যের উৎপাদন ঘটিয়ে পণ্যের মালিক হিসেবে বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্যটি নিয়ে এসে বিনিময়ে বাড়তি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এখানে সমাজে বিনিময় ব্যাপারটি মুদ্রা— পণ্য— মুদ্রা বা ম— প— ম' পদ্ধতিতে ঘটে থাকে। লক্ষণীয়, ম ও ম' দুটি আলাদা বস্তু। ধনতান্ত্রিক যুগে পণ্যের বদলে যে মুদ্রা পাওয়া যায় তার পরিমাণ পণ্য বিনিময়ের আগে উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত মুদ্রার চেয়ে বেশি। ম— প— ম', এই ছকের মধ্যে ম'>ম, অর্থাৎ ম' পরিমাণে ম-এর চেয়ে অধিক। এই ব্যাপারটির আঙ্কিক প্রতিরূপ দাঁড়াবে, ম'=ম+△ম। ম-এর সঙ্গে বাড়তি মুদ্রা (△ম) যুক্ত হয়ে ম'-এর উদ্ভব ঘটে। এই বাড়তি মুদ্রাকে উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value) বলা চলে। ধনতান্ত্রিক যুগে বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত মূল্যের সংগ্রহ হয়ে থাকে।

উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রকৃত জনক শ্রমিকের শ্রম। উদ্বৃত্ত মূল্য পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ধনতন্ত্র-পূর্ব বিনিময় ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল না কেন না উৎপাদক নিজেই বিক্রেতার ভূমিকা নেয়—ধনতান্ত্রিক যুগে উৎপাদক শ্রমিক কেবল শ্রমের জোগান দেয়—উৎপাদন যন্ত্রের মালিক শ্রমিকের শ্রমজাত পণ্যের বিক্রেতা, অতএব পণ্যের উৎপাদনজাত মূল্য ও বিক্রয় মূল্য এক হয় না। বিক্রয়ের পর দেখা যায় বিক্রয় মূল্য উৎপাদনজাত মূল্যের চেয়ে বেশী হয়। উৎপাদন যন্ত্রের মালিক শ্রমিককে দেয় মূল্যের চেয়ে অধিকতর মূল্যে পণ্যটি হাতছাড়া করে, এ ক্ষেত্রে বাড়তি মূল্যের মালিক

হোল বিক্রেতা-পুঁজিপতি। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগে বিক্রয় মূল্যের সবটাই ছিল শ্রমিক বা কারিগরের প্রাপ্য। বিক্রয় মূল্য উৎপাদনজাত মূল্যের সমান ছিল।

ধনতন্ত্রের যুগে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি দুটি চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয় :

১ পুঁজিপতির অধীনে শ্রমিক পণ্যোৎপাদনে নিয়োজিত হয়।

২ উৎপাদিত পণ্যের মালিক পুঁজিপতি—শ্রমিক নয়।

ধনতন্ত্রের যুগে পণ্য উৎপাদনে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক মূল্যের (Use Value) জন্ম হয় না, ব্যাবহারিক মূল্যের সঙ্গে বাড়তি বা উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্ম ঘটে—উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্ম দেওয়া ধনতান্ত্রিক যুগের লক্ষ্যও বটে।

পণ্য উৎপাদনের জন্য লগ্নীজাত মূলধনের যে অংশ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও অন্যান্য উৎপাদন-সহায়ক দ্রব্যাদির জন্য নিয়োজিত হয় উৎপাদন কার্যে রত হওয়ার ফলে তার পরিমাণগত কোনো পরিবর্তন হয় না। মার্কস মূলধন বা পুঁজির এই অংশকে বলেছেন 'অপরিবর্তনীয় মূলধন' (constant capital)। মূলধনের যে অংশ শ্রমিকের মজুরী হিসেবে ব্যয়িত হয় উৎপাদন চলাকালীন অবস্থায় তার পরিমাণগত পরিবর্তনও ঘটে—উৎপাদন শেষে দেখা যায় যে সমমূল্যের চেয়ে বাড়তি মূল্যমানের উদ্ভব ঘটেছে দ্বিতীয়োক্ত মূলধনের নিয়োগে। মার্কস একে বলেছেন 'পরিবর্তনশীল মূলধন' (Variable Capital)।

উৎপাদন শেষে সমগ্র আয়ের মধ্যে যে উদ্বৃত্ত মূল্যমানের উদ্ভব ঘটে তা সম্পূর্ণই পরিবর্তনীয় মূলধন-জাত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে কেন না প্রথমোক্ত মূলধন ব্যয় একটি স্থায়ী ব্যাপার। সুতরাং উৎপাদনজাত আয় বা পণ্যের সামগ্রিক মূল্যমান নিম্নোক্তভাবে প্রকাশযোগ্য :

মূল্যমান=অপরিবর্তনীয় মূলধন+পরিবর্তনীয় মূলধন+উদ্বৃত্ত মূল্য বা সংক্ষেপে, ম=অ+প+উ।

সংক্ষেপে অ, প, উ সামগ্রিক মূল্যমানের বিভক্ত অংশ। আঙ্কিক নিয়মে উদ্বৃত্ত মূল্য ও পরিবর্তনীয় মূলধনের অনুপাত উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের সমান, অর্থাৎ

$$\text{উদ্বৃত্ত মূল্যের হার} = \frac{\text{উ}}{\text{প}}$$

দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদিত পণ্যের সমগ্র মূল্যমান মূলধন ও শ্রমিকের শ্রমে প্রস্তুত হয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় মূলধন ও শ্রমিকের শ্রম সমার্থক। শ্রমিকের শ্রম নিয়োগে পরিবর্তনীয় মূলধনেই উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু পরিবর্তনীয় মূলধন জাত পণ্যের অংশভাগের সবটাই শ্রমিকের দখলে আসে না, কিছু অংশ উৎপাদন যন্ত্রের মালিক দখল করে নেয়। যে অংশটি শ্রমিক পায় সেটা তার বেঁচে থাকার মত মজুরী—তার অস্তিত্ব বজায় রাখার মত আয়। শ্রমিকের সমগ্র কার্যকালের যে ভগ্নাংশটুকু ব্যয় করলে ওই অস্তিত্ব বজায় রাখার মত মজুরী জোটে সেই সময়কে শ্রমিকের একান্ত 'প্রয়োজনীয় সময়' বলা হয়—সেই সময়ের শ্রমটুকুকে 'প্রয়োজনীয় শ্রম' বলা হয়—বাকী সময়ের অংশ ও শ্রমের অংশ মালিকের ভোগে লাগে। বাকী সময়ে ও শ্রমে পণ্যোৎপাদনে উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে। এই অংশের সময় ও শ্রমকে 'উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়' (Surplus Labour-time) ও 'উদ্বৃত্ত শ্রম' (Surplus Labour) বলা চলে। উদ্বৃত্ত 'শ্রম-সময়' ও 'প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়'-এর যোগে শ্রমিকের সম্পূর্ণ 'শ্রম-সময়'টি পাওয়া যাবে।

'উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়জাত মূল্যমানের' (Value generated by surplus labour-time or surplus value) অংশ বা উদ্বৃত্ত মূল্যমান থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করাই হোল শ্রমিক শোষণ। উপরিউক্ত নিয়মে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার-ই (উ/প) শ্রমিক শোষণের মাত্রার (degree of labour exploitation) নির্দেশক। উদ্বৃত্ত মূল্যের হার থেকে শ্রমিক শোষণের মাত্রা নিম্নোক্ত উপায়ে বুঝানো যাবে :

$$\text{উদ্বৃত্ত মূল্যের হার} = \frac{\text{উ}}{\text{প}} = \frac{\text{উদ্বৃত্ত মূল্য}}{\text{পরিবর্তনীয় মূলধন}}$$

$$= \frac{\text{উদ্বৃত্ত মূল্য}}{\text{প্রয়োজনীয় শ্রম}} = \frac{\text{অদেয় শ্রম-মূল্য}}{\text{দেয় শ্রম-মূল্য}}$$

উপরিউক্ত অনুপাতের অদেয় শ্রম-মূল্য বা অদেয় মজুরী পরিমাণে যত বাড়বে, শ্রমিক শোষণের মাত্রাও তত বাড়বে। সুতরাং উক্ত অনুপাত দিয়েই শ্রমিক শোষণের মাত্রার পরিমাপ পাওয়া যাবে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মই হোল উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়টুকু বাড়িয়ে নেওয়া। উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়জাত মূল্যমানের বা উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ ধনতান্ত্রিক যুগে নতুন মূলধন হিসেবে পরিগণিত হয়। উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয় থেকে নতুন মূলধনের সঞ্চয় গড়ে ওঠে। এই নতুন মূলধন পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সঞ্চিত মূলধন থেকে ক্রমাগত নতুন মূলধনের উদ্ভব ঘটে—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এটাই নিয়ম। নতুন মূলধনের যোগান ক্রমাগত উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা তথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখে।

উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয় থেকে নতুন মূলধন ও নতুন মূলধন পুনরুৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে আরো উদ্বৃত্ত মূল্য তথা আরো মূলধনের সমাবেশ ঘটাতে থাকে। এই ভাবে ক্রমাগত মূলধনের সঞ্চয় ও উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে ধনতান্ত্রিক যুগে শোষিত মানুষের সংখ্যা ও শোষণের মাত্রা দুই-ই বাড়তে থাকে।

২

ক্যাপিটালের ২য় খণ্ডের উপনাম: 'পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়া' (The Process of Circulation of Capital)। এ ক্ষেত্রে মার্কস ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুঁজির গতিবিধি, যথা, পুঁজির চক্রবৎগতি বা আবর্তন, নিয়োজিত পুঁজির পণ্যে রূপান্তর ও পরিশেষে বাজার-পদ্ধতির (market mechanism) মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থায় বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও মূল্যমানের মধ্যেকার ভারসাম্যের অবস্থায় সরল পুনরুৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটের প্রশ্নও দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থায়িত্ব নেই। ভারসাম্যের অবস্থা থেকে তার নিয়মিত বিচ্যুতি, কেন না ক্রমাগত উদ্বৃত্ত মূল্য আকর্ষণের পরিণামে এক সময়ে উৎপাদনী ব্যবস্থাকে সাধ্যমত ক্রিয়াশীল রাখা যায় না, তখনই অর্থনৈতিক সংকটের অবস্থা দেখা দেয়।

মার্কস দেখিয়েছেন, মূলধনের চক্রাবর্তন তিনটি স্তরে সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম স্তর: পুঁজির মালিক ক্রেতা হিসেবে বাজারে আবির্ভূত হন। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমিকের শ্রম ক্রয়ের কারণে তার পুঁজি বা

মূলধন নিয়োজিত হয়। এই ভাবে মূলধন বা নগদ মুদ্রা উৎপাদনের প্রথম স্তরে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এই স্তরে নিয়োজিত মূলধন পণ্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত হয়ে যায়, ফলে যে উৎপাদিত পণ্যের উদ্ভব হয় তা নিয়োজিত উপাদান গুলিকে দেয় মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য বহন করে।

তৃতীয় স্তর ঃ উৎপাদিত পণ্য নিয়ে পুঁজির মালিক এই বারে বিক্রেতা হিসেবে বাজারে আবির্ভূত হন। পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করেন। মূলধনের প্রথম চক্রাবর্তন এই স্তরে সম্পূর্ণ হয়। ফলে এই স্তরে প্রথম স্তরের নিয়োজিত মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত আয় সংগৃহীত হয়।

তিনটি স্তর পরিক্রমা করে মুদ্রা—পণ্য—মুদ্রা এই ধরনের প্রথম চক্রাবর্তন সমাপ্ত হয়। পরের আবর্তন আরম্ভ হয় প্রথম পরিক্রমা শেষে অতিরিক্ত মূলধনী সম্পদ নিয়ে। শুরু হয় পুনরুৎপাদনের। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে মূলধনী সম্পদ লগ্নীকৃত হতে থাকে।

উৎপাদনী বিনিময়ের সংক্ষিপ্ততম প্রণালী হোল ম → প → ম′, (ম′>ম) অর্থাৎ, ম-এর চেয়ে পরিমাণে বেশী হবে ম′। এই পদ্ধতির প্রভাবে নিয়োজিত মূলধনের প্রয়োগে অতিরিক্ত মূলধন সংগৃহীত হয়। যে ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির সাহায্যে অতিরিক্ত সম্পদের জন্ম ঘটে তা হোল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজির সঞ্চালনের (circulation of capital) ফলে ওই সম্পদ আহৃত হয়।

পুঁজির মালিক বাজারে প্রবেশ করে মূলধন দুভাগে ব্যয় করে। প্রথম ভাগে উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল, দ্বিতীয় ভাগে শ্রমিক মজুরী। ম→প→ম′ এই আবর্তনের গোড়ার দিক যথা ম→প, অর্থাৎ মূলধনের পণ্যে রূপান্তরের প্রথম ধাপে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশযোগ্য :

→শ্রমিক বেতন

ম → প

→মূলধনী ব্যয়

উপরিউক্ত ছক থেকে জানানো হচ্ছে যে, পণ্য প্রস্তুতির সময়ে শিল্প-মালিককে প্রধানত দুটি ভাগে খরচ করতে হয় শ্রমিক বেতন ও যন্ত্রপাতির দরুন ব্যয়। যন্ত্রপাতির দরুন ব্যয়কে মূলধনী ব্যয় বলা হয়।

উপরিউক্ত ছকটি থেকে দুটি ঘটনা বুঝে নিতে হবে :

১ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানে মূলধনী অর্থের রূপান্তর, মূলধনী ব্যয় ও মজুরী ব্যয়—এটি মূলধনী অর্থের গুণগত পরিবর্তন।

২ উপাদান সমূহের পরিমাণগত সম্পর্ক অর্থাৎ মূলধনী ও মজুরী ব্যয়ের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষাকারী সম্পর্কও প্রকাশ পায় ওই ছক থেকে।

এই অবস্থায় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ এমন ভাবে হয় যাতে উৎপাদন শেষে নিয়োজিত মূলধনের চেয়েও বেশী সম্পদের জন্ম হতে পারে। উৎপাদনী মূলধন সমপরিমাণ মূল্য ও তৎসহ উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্ম দিতে সক্ষম হবে।

এই অবস্থায় পণ্য উৎপাদনের কারণে মূলধনের যথাযথ সমাবেশ হতে দেখা যায় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় উৎপাদনী মূলধনের সক্রিয়তার আরম্ভ অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের শুরু। দ্বিতীয় অবস্থায় মূলধনী ব্যয় ও মজুরী ব্যয় শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ায় (labour process) উদ্বৃত্ত মূল্য সহ পণ্যের জন্ম দান করে। দ্বিতীয় অবস্থার শেষে উৎপাদনী মূল্য পণ্যমূল্যে পরিণত হতে থাকে।

তৃতীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটে যখন উৎপাদিত পণ্যের নিহিত মূল্য মুদ্রায় পরিণত করা হয়। উৎপাদনী মূল্যের পণ্যমূল্যে রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়, সংক্ষেপে এটি মূলধনের চক্রাবর্তনের শেষ অংশ প——>ম´-এর পর্যায়। মূল্যানুযায়ী পণ্যকে নগদ টাকায় পরিণত করা হয়।

মার্কসীয় মতে এখানেই 'সার্কিট অব ক্যাপিটাল' বা মূলধনের উৎপাদনী পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। এই পরিক্রমা পরিষ্কার তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে সঞ্চিত সম্পদের উৎপাদনী মূলধনে রূপান্তর (transformation of

Capital Value)। দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদনী মূলধনের পণ্যে রূপান্তর। তৃতীয় স্তরে পণ্যের নগদ মুদ্রায় পরিণতি।

সরল পুনরুৎপাদন

পণ্যমূল্যকে মূলধনী ব্যয়, মজুরী ব্যয় ও উদ্বৃত্ত মূল্যে বিভাজন করে মার্কস ধনতন্ত্রের প্রাথমিক উৎপাদন ব্যবস্থার সরলতম কাঠামো রচনা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু চলিত সমাজ ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিক ব্যবস্থার ছকও মার্কস সরল পুনরুৎপাদনের আঙ্কিক নিয়মে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডে সরল পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণ আধুনিক অর্থনীতির এক দিগন্ত উন্মোচনকারী অধ্যায়। সরল পুনরুৎপাদনের তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজের সমগ্র উৎপাদন দুটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়:

বিভাগ—I: উৎপাদনী পণ্য অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্র সমূহ বা মূলধনী পণ্যের উৎপাদন।

বিভাগ—II: ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন।

দুটি বিভাগের যথাযথ আনুপাতিক উৎপাদন সমাজের সমগ্র অর্থনীতির প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রচনা করে।

আবার উপরিউক্ত প্রতি বিভাগের পণ্যোৎপাদনের পূর্বে দুটো করে অংশ থাকে:

ক অপরিবর্তনীয় মূলধন (অ)।
খ পরিবর্তনীয় মূলধন (প)।

কিন্তু উৎপাদনের পর পণ্যমূল্যকে তিনটি উপাদানে বিভক্ত করা যায়। উপরিউক্ত দুটি উপাদানের (ক ও খ-এর) সঙ্গে আর একটি বাড়তি উপাদান যুক্ত হয়। উপাদান তিনটি নিচে বিবৃত হোল।

১ স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় মূলধন (অ), যা উৎপাদনী পদ্ধতির মারফৎ পণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

২ পরিবর্তনীয় মূলধন (প), যা আসলে পণ্যোৎপাদনের মজুরী ব্যয়।

৩ উৎপাদনী পদ্ধতির সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য (উ)।

উপরিউক্ত উপাদান তিনটি নিয়ে মার্কসীয় পণ্যমূল্যের সংক্ষেপিত গাণিতিক রূপ: অ+প+উ=ম। ম অর্থে পণ্য মূল্য।

সরল উৎপাদনের মত সরল পুনরুৎপাদনের ভারসাম্যেরও দুটি শর্ত, যথা, মূলধনী পণ্যের উৎপাদন ও ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন। চলিত সমাজ ব্যবস্থায় মূলধনী পণ্য ও ভোগ্য পণ্যের ভারসাম্যাবস্থা গাণিতিক নিয়মে দেখানো যায়।

সরল পুনরুৎপাদন জাত ভারসাম্যের প্রথম বিভাগে মূলধনী পণ্যের উৎপাদন। দ্বিতীয় বিভাগে ভোগ্য পণ্যের। এই দুই বিভাগকে তিনটি করে উপাদানে বিভক্ত করে দেখানো যেতে পারে নিম্নোক্ত ছকে।

॥ সরল পুনরুৎপাদনের ছক ॥

উৎপাদনী বিভাগ	অপরিবর্তনীয় মূলধন	পরিবর্তনশীল মূলধন বা মজুরী ব্যয়	উদ্বৃত্ত মূল্য
I. মূলধনী পণ্য	৪০০০ (অ)	১০০০ (প)	১০০০ (উ)
II. ভোগ্য পণ্য	২০০০ (অ)	৫০০ (প)	৫০০ (উ)

উপরিউক্ত সারির দ্বিতীয় বিভাগের (II) ৫০০ (প) ও ৫০০ (উ) যথাক্রমে মজুরী ব্যয় ও পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মূল্য শেষ পর্যন্ত সমাজে পণ্যক্রয়ে ভোগের জন্য ব্যয়িত হয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে, প্রথম বিভাগের (I) ১০০০ (প) ও ১০০০ (উ) পণ্যের বাজারেই ব্যয়িত হয়। মূলধনী পণ্য বিভাগের ১০০০ (প) ও ১০০০ (উ) ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হলে এদের সমষ্টি ২০০০ (প+উ) শেষ পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য বিভাগের অপরিবর্তনীয় মূলধনে [২০০০ (অ)] রূপান্তরিত হতে পারে। এই ভাবে প্রথম বিভাগের ভোগ জনিত ব্যয় দ্বিতীয় বিভাগের পুনরুৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। পুনরুৎপাদনের অতি সরল আঙ্কিক ভিত্তিতে দেখানো চলে যে, প্রথম বিভাগের শেষ দুটি উপাদানের সমাবেশ (প+উ) দ্বিতীয় বিভাগের (অ)-এর সমান হতে পারে।

উপরিউক্ত অতি সরল আঙ্কিক নিয়মে দেখানো যায় যে, চলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পণ্যমূল্য, মজুরী, মূলধন ইত্যাদি উপাদানের মধ্যে তথাকথিত

ভারসাম্য কেমন ভাবে রচিত হয়। সমগ্র উৎপাদনী ব্যবস্থায় মূলধনী পণ্য ও ভোগ্যপণ্যের যথাযথ আনুপাতিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে পুনরুৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু ক'রে ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখে।

লগ্নী, পুনর্লগ্নী ও ক্রমাগত উৎপাদন জাত পণ্যের সরবরাহ ও বাজারের সক্রিয়তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চিরকাল শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যের বাজার দর ও বিনিময় ব্যবস্থা-জাত জটিল অবস্থায় মারাত্মক স্ববিরোধ দেখা দেয়। এই অন্তর্নিহিত বিরোধের জন্য পুঁজিবাদ মানব সমাজে কোনো চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। ভারসাম্যের অবস্থা থেকে তার বিচ্যুত হবার একাধিক কারণ ঘটে— এর মধ্যে প্রধানতম হোল, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণে সচেষ্ট থাকার দরুন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন কোনো প্রকারেই আর্থিক ব্যবস্থা থেকে যা সংগ্রহ করা চলে না, সেই উদ্বৃত্ত মূল্য সেই অবস্থাতেও পুঁজির মালিক সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে পণ্যোৎপাদন ও বিনিময়ের মধ্যে অভাবিত সংকট দেখা দেয়। এই বক্তব্যের বিশ্লেষণে মার্কসীয় অর্থনীতির 'সংকট তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠিত।

৩

ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের উপনাম: 'ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র' (The process of capitalist production as a whole)। এখানে প্রসঙ্গত মার্কস বিশেষ বিশেষ মূল্যমানের প্রশ্ন, পুঁজির মুনাফার হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিভাজন থেকে প্রাপ্ত মুনাফার কথা এনেছেন। পণ্যের উৎপাদনী মূল্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং সুদ ও খাজনার প্রশ্নে আগের দুখণ্ডের আলোচনা থেকে আরো বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় এসেছেন।

মার্কস দেখিয়েছেন, পণ্যোৎপাদনে পুঁজির মালিকের ব্যয়ের পরিমাণ ও পণ্যের যথার্থ উৎপাদন ব্যয় সমান নয়। পণ্যোৎপাদনে পুঁজির মালিকের ব্যয় আসলে উৎপাদনী যন্ত্র, কাঁচামাল এবং শ্রমিক-মজুরী বাবদ ব্যয়। কিন্তু পণ্যোৎপাদনের জন্য প্রকৃত আর্থিক পরিমাণ উপরের তিনটি ব্যয়ের যোগফলের থেকেও বেশি। অর্থাৎ পণ্যের আসল যা উৎপাদনী ব্যয় পুঁজির মালিককে তার চেয়ে কম খরচ করতে হয়, কেন না শ্রমিক মজুরীর একটি অংশ মালিকের

অদেয় থাকে, যে অংশটি আসলে পণ্যের উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান, নয় তো অংশ বিশেষ। পণ্যের উৎপাদনে শ্রমিকের শ্রম যতটা ব্যয়িত হয় পণ্যের বিনিময় মারফৎ যে বাজার দরের (market price) উদ্ভব ঘটে তা দিয়ে শ্রমিকের যথাযথ প্রাপ্য শ্রমিকের ভাগ্যে জোটে না, অথচ পণ্যের উৎপাদনের কারণে যে ব্যয় হয় বাজার দরের সঙ্গে তার প্রভেদ থাকে। বাজার দর তার চেয়ে বেশি হয়। উৎপাদনী যন্ত্র, কাঁচামাল ও শ্রমিক মজুরী এই তিন বিষয়ের সমষ্টিগত ব্যয়ের চেয়ে পণ্যের বাজার দর বেশি। সুতরাং পণ্যের উৎপাদন জনিত ব্যয়ের থেকে বাজার দরে যে অংশ বাড়তি থাকে তাই হোল পণ্যের উদ্বৃত্ত মূল্য।

সংক্ষেপে উ, যাকে আমরা উদ্বৃত্ত মূল্য বলছি, তা আসলে পরিবর্তনশীল মূলধনের বর্ধিতাংশ। পরিবর্তনশীল মূলধনের মধ্যে রয়েছে শ্রমিকের শ্রমমূল্য। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সমস্ত উৎপাদনী উপাদান যথাযথ মূল্য সহ প্রবিষ্ট থাকে কিন্তু পণ্যের বিনিময় মারফৎ উপাদানগুলির জন্য মোট ব্যয়িত মূল্যের চেয়ে বেশি আয় সংগৃহীত হয়। এই বর্ধিত আয়ের কারণ হিসেবে নিশ্চিত করে বলা যাবে যে, এই বর্ধিত আয়ের স্রষ্টা শ্রমিকের শ্রম যা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয় বলেই পণ্যের উৎপাদন ঘটে। উৎপাদনী পদ্ধতির মধ্যে শ্রমজীবীর সঠিক শ্রম নিহিত হলেও শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হয় না, ফলে বাজার দরের কারণে যে আয় হয় শ্রমিক বেতন বা পরিবর্তনশীল মূলধনের থেকেও তা বেশি হয়। সেই বাড়তি অংশ থেকেই মুনাফা জন্ম নেয়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের পরিণতি ম → প → ম´, এই পদ্ধতিতে প্রকাশ পায় বলে বলা চলে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজের মূল্যমান ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে—যেহেতু ম এর চেয়ে ম´ পরিমাণে বেশি। এইভাবে ক্রমাগত উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ বেড়ে চলে।

পরিবর্তনশীল মূলধনের তুলনায় উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাপ বা উদ্বৃত্ত মূল্য ও পরিবর্তনশীল মূলধনের অনুপাত, যথা উ/প এই আঙ্কিক সংখ্যাকে 'উদ্বৃত্ত মূল্যের হার' বলা চলে। ভাষান্তরে, 'শোষণের হার'।

আবার সমগ্র মূলধনের তুলনায় উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাপ বা উদ্বৃত্ত মূল্য ও সমগ্র মূলধনের অনুপাত যথা উ/(অ+প)—এই আঙ্কিক সংখ্যা 'মুনাফার হার' হিসেবে পরিগণিত হবে।

এর পরেই মার্কস সমগ্র উৎপাদনী ব্যবস্থায় মুনাফা-হারের সমতা বা 'গড়' (average rate of profit)-এর প্রসঙ্গে এসেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন যে, উৎপাদনী ব্যবস্থায় ক্রমাগত প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পণ্য উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় অর্থাৎ এক পণ্যোৎপাদন থেকে অন্য পণ্যোৎপাদনে পুঁজির পুনর্বণ্টন ঘটে। উৎপাদনী ব্যবস্থায় কোথাও দেখা যায় যে, পণ্যের প্রকৃত মূল্যের (Value) চেয়ে বেশি মূল্যে অর্থাৎ অধিক বাজার দরে (price), কোথাও বা কম মূল্যে পণ্য বিক্রীত হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনে মুনাফা-হারের তারতম্য ঘটে কিন্তু অধিক মুনাফা-হারের আকর্ষণ বা মুনাফার বদলে ক্ষতির আশঙ্কা পণ্যোৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় ক্রমাগত পুঁজির পুনর্বণ্টন ঘটায়। ফলে, উৎপাদনী ব্যবস্থা ক্রমশই মুনাফা-হারের সমতার দিকে এগিয়ে চলে।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকেই মার্কস পণ্যের 'উৎপাদনী মূল্যের' প্রসঙ্গে এসেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন যে, পণ্যের উৎপাদনী মূল্য আসলে তিনটি উপাদানের যোগফল: ১. অপরিবর্তনীয় মূলধন, ২. পরিবর্তনশীল মূলধন, ৩. গড় মুনাফা। পণ্যের বাজার দর ও প্রকৃত উৎপাদনী মূল্যের মধ্যে যে ফারাক থাকে তার কারণ হোল চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসমতা।

পণ্যের প্রকৃত উৎপাদনী মূল্য ও পুঁজিপতির ব্যয়িত উৎপাদনী মূল্য, দুয়ের মধ্যে ফারাক থাকে। পুঁজিপতির ব্যয়িত উৎপাদনী মূল্যে শ্রমমূল্য যা ধরা হয় তা প্রকৃত শ্রমমূল্য নয়। প্রকৃত শ্রমমূল্যের অংশ ভাগ। শ্রমিকের প্রকৃত শ্রমমূল্য দেওয়া হলে পুঁজিপতির উৎপাদনী ব্যয় বেড়ে যায় এবং ওই উৎপাদনী ব্যয় আসলে পণ্যমূল্যের সমান হয়ে যায়। পণ্যের বাজার দর ও পণ্যমূল্য সমান নাও হতে পারে। তার কারণ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের অসমতা।

এর পরেই মার্কস ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় 'মুনাফা-হার হ্রাসের সূত্র' বিশ্লেষণ করেছেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি মুনাফার উৎপাদন হার সমান রাখতে পারে না—উৎপাদনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 'মুনাফা-হার' কমতে থাকে। মার্কস দেখিয়েছেন যে, ক্রমাগত যন্ত্রকুশলতা ও উৎপাদন হার বৃদ্ধির চাহিদায় উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমশ পরিবর্তনশীল মূলধনের চেয়ে অপরিবর্তনীয় মূলধনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সমগ্র মূলধনের পরিমাণও বাড়তে থাকে। ফলে দেখা যাবে যে, ওই একই অপরিবর্তিত উৎপাদনী পরিবেশে অপরিবর্তনীয়

মূলধনের বৃদ্ধির কারণ মুনাফা-হারের হ্রাস ঘটায়। শ্রমিক শোষণের মাত্রা বেড়ে গেলে মুনাফা-হার হ্রাসের প্রবণতা রোধ করা যায়।

সুদ

সুদ-এর প্রশ্নে এসে মার্কস সুদকে মুনাফার অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন। সম্পত্তি বা পুঁজির মালিকের কাছ থেকে শিল্প-মালিক মূলধন রূপে পণ্যোৎপাদনের জন্য যে অর্থ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করে তার জন্য মুনাফার অংশ থেকে যে অংশ পুঁজির মালিকের প্রাপ্য হয় তাই হোল সুদ।[১] পণ্যোৎপাদনের জগতে সুদ-এর উদ্ভব ও সুদ-এর চেহারার বিশ্লেষণ দিয়েছেন মার্কস। উৎপাদনের মালিকানা ও মূলধনের উৎস দুটির বিভিন্ন অস্তিত্ব থাকার দরুন সুদের জন্ম। যেখানে মূলধন ও উৎপাদন ব্যবস্থা দুটির মালিকানা একই ব্যক্তির সেখানে সুদ-এর প্রসঙ্গ ওঠে না। দুটি মালিকানা বিভিন্ন থাকলে ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণের প্রথার উদ্ভব ঘটে। পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্পপতি (industrial capitalist) ও পুঁজিপতি (money capitalist) দুজনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকার দরুন স্বতন্ত্র সক্রিয়তা জন্ম নেয়।

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ্ সুদ-কে পুঁজির মূল্য হিসেবে দেখিয়েছেন। সুদ-এর এই সংজ্ঞাকে মার্কস যুক্তিবিরুদ্ধ (irrational) সংজ্ঞা বলেছেন। নগদ অর্থসম্পদের পুঁজি হিসেবে ব্যাবহারিক মূল্য আছে অর্থাৎ পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এই অর্থসম্পদ উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্ম দানে সহায়তা করে সুতরাং আসলে পুঁজির ব্যবহারের দরুন যে উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব তাকে পুঁজির মূল্য আখ্যা দেওয়া যায় না। মার্কস বলেছেন কোনো আর্থিক পদ্ধতির পরিণাম বা সক্রিয়তা থেকে এর উদ্ভব ঘটে না— বিশেষ আইনগত চুক্তির দরুন সুদ-এর উদ্ভব ঘটে কেন না মূলধনের ব্যবহারের কারণে যে আয়বৃদ্ধি হয় সেই আয় থেকে মূলধনের মালিককে কিছু ভাগ দেওয়ার চুক্তিতে এর উদ্ভব। মূলধনের মালিক ও পণ্যোৎপাদনের মালিক একই ব্যক্তি হলে সুদ-এর জন্য কোনো চুক্তিও করতে হয় না— সেখানে সুদের জন্ম ঘটে না। মুনাফার ভাগ থেকে

---

১ *"It is merely another name, a special term, for a certain part of the profit, which capital in process of its function has to give up to its owner, instead of keeping it in its own pockets."* (Capital III Vol. p. 398)

শিল্প-মালিক পুঁজির মালিককে সুদ দিয়ে থাকেন। পণ্যোৎপাদন থেকে মুনাফারই উদ্ভব ঘটে, মুনাফার অংশ বিশেষ প্রয়োজন হলে সুদ হিসেবে পরিগৃহীত হয়। মার্কসীয় অর্থনীতিতে সুদের সংজ্ঞা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে ভিন্ন।

খাজনা

তৃতীয় খণ্ড ক্যাপিটালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল খাজনার তত্ত্ব (Theory of Rent)।

ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ম যেমন শিল্পোৎপাদনে প্রযুক্ত হয় তেমনি কৃষি-কর্মেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে। ব্যাপক শিল্পায়নের দরুন সমাজে শ্রমবিভাজনের বিস্তৃতির ফলে কৃষিজ পণ্য বাজারে বিক্রয়ার্থ এসে পড়ে। কৃষিজ উৎপাদন ধনতান্ত্রিক বাজার ও বিনিময়ের অংশ হয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক কৃষিজ উৎপাদনের আয় তিন শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হয়। এই তিন শ্রেণী ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার দান :

১ নির্ধারিত বেতনে কৃষি শ্রমিক।

২ কৃষি শ্রমিকের নিয়োগকারী মুনাফার অধিকারী কৃষক।

৩ খাজনা গ্রহণকারী জমির মালিক।

ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য :

১ এখানেও উৎপাদনের কাজে নির্ধারিত বেতনে শ্রমিক আর নিয়োগকারী চাষী-মালিকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২ জমির মালিকের কাছ থেকে ভূমিহীন চাষী বার্ষিক খাজনার ভিত্তিতে চাষের জন্য জমি ব্যবহার করে। এখানে কৃষিতে বিনিয়োগকারী চাষী জমিদারকে বার্ষিক অনুদান যা খাজনা নামে অভিহিত তা প্রদান করে।

মার্কসীয় মতে একই মাপের বিভিন্ন জমিতে সম-পরিমাণ বিনিয়োগের ফলে যে আয়ের পার্থক্য ঘটে সেই পার্থক্য জনিত উদ্বৃত্ত-ই খাজনা হিসেবে পরি-গণিত হয়।

মার্কস খাজনাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :

ক পার্থক্য জনিত খাজনা (১); কৃষিকর্মে ব্যাপক জমির ব্যবহারের দরুন যার উদ্ভব।

খ পার্থক্য জনিত খাজনা (২) ; জমিতে নিবিড় চাষের (intensive cultivation) দরুন যার উদ্ভব।

গ বিশুদ্ধ খাজনা—জমিতে একচেটিয়া দখলীর ফলে যার উদ্ভব।

ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ডের সমগ্র বিশ্লেষণ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সামগ্রিক ভাবে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজে ক্রমাগত শোষিত হয়ে চলেছে। এই সমাজে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে, যা নাকি শ্রমিকের শ্রম-মূল্যের অদেয় অংশ, তা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আকারে পুঁজিবাদী শ্রেণীর ভোগে লাগে। কখনো মুনাফা হিসেবে, কখনো সুদ হিসেবে, কখনো খাজনা হিসেবে।

সমগ্র ক্যাপিটাল পুস্তকে মার্কস অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে অনিবার্য সংকট দেখা দেয়। উৎপাদন পদ্ধতির চরিত্র যেখানে সামাজিক, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার যতই বাড়বে উৎপাদিকা শক্তি বা নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর ততই সংখ্যাধিক্য ঘটবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অবস্থা ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকা শক্তির সংঘর্ষ বাড়তে থাকবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পদ ও পুঁজির স্ফীতি প্রচলিত উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থায় সংকটের সৃষ্টি করে। প্রধানত দুই ধরনের সংকটের চাপে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট—২

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব

ডাস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে মার্কস ক্যাপিটালের মোট চারটি খণ্ড রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মার্কসের অভিপ্রায় ছিল চতুর্থ খণ্ডে তাঁর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের একটি বিস্তৃত ইতিহাস থাকবে। মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে এঙ্গেলস ক্যাপিটালের ২য় ও ৩য় খণ্ডের সম্পাদনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ক্যাপিটালের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে, ৩য় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধে এঙ্গেলস বলেছেন যে, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়কালে রচিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটা অংশ আছে মার্কস যার শিরোনাম দিয়েছেন "উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব" (Theorien uber der Mehrwert)। পাণ্ডুলিপির এই অংশটি এঙ্গেলস ২য় ও ৩য় খণ্ড থেকে আলাদা করে রেখে আর একটি খণ্ড (চতুর্থ) সম্পাদনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিন্তু এঙ্গেলস এই কাজ শুরু করে যেতে পারেননি। ১৮৯৪ সালের শেষের দিকে ক্যাপিটাল ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আর কয়েক মাস মাত্র এঙ্গেলস বেঁচে ছিলেন। এঙ্গেলসের মৃত্যু হয় ৫ই আগস্ট ১৮৯৫। এঙ্গেলসের অসমাপ্ত কাজে হাত দিলেন কার্ল কাউট্স্কি। কাউট্স্কি চার খণ্ডে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করেন 'Theorien uber der Mehrwert' এই শিরোনামে (১৯০৫—১০)। কিন্তু কাউট্স্কির সম্পাদিত সংস্করণ বিভিন্ন ত্রুটিতে ভরা বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন।

১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত কালসীমায় মার্কস লিখিত ২৩টি নোটবই পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ষষ্ঠ থেকে পঞ্চদশ এবং অষ্টাদশ নোটবই নিয়ে মোট ১১টি খসড়ায় মার্কস 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' এই অভিধায় ক্যাপিটাল চতুর্থ খণ্ডের মূল বক্তব্য বিবৃত করে গেছেন। মূল বক্তব্যে মার্কস ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস প্রসঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের তাত্ত্বিক ধারণার ক্রমবিকাশ ও তৎসহ সামন্ততান্ত্রিক থেকে ধনবাদী সমাজে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস বিবৃত করেছেন।

প্রথম অংশে মার্কস ধনবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফিজিওক্র্যাটদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। ফিজিওক্র্যাটরাই প্রথম জানান যে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে। অবশ্য মার্কসের মতে এই চিন্তাধারা নিখুঁত ছিল না। বিশেষ করে দ্বৈত চিন্তার অন্তর্দ্বন্দ্বও ছিল। কেন না কখনো তাঁরা বলছেন উদ্বৃত্ত মূল্য প্রকৃতির দান, কখনো দেখাচ্ছেন অধীনস্থ চাষী বা কৃষি-শ্রমিকের বিশেষ পরিশ্রমলব্ধ বাড়তি উৎপাদন, যা জমির মালিক আত্মসাৎ করে থাকে। মার্কস দেখিয়েছেন যে, ফিজিওক্র্যাটদের চিন্তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অ্যাডাম স্মিথও অতিক্রম করতে পারেননি। অ্যাডাম স্মিথের তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্যের মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ধারা পাওয়া যাবে তেমনি চিন্তার দৈন্যও প্রকট হয়েছে যুক্তিবিন্যাসের বিকৃতি ঘটিয়ে।

উদাহরণ স্বরূপ মার্কস তুলে ধরেছেন স্মিথের পণ্যের বিশ্লেষণে বিনিময় মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটি। একই পণ্যের মূল্য স্মিথ দুরকম ভাবে দেখিয়েছেন, যার ফলে পণ্যমূল্যের বিশ্লেষণ দুরকম হয়ে যায় এবং দুধরনের মূল্য প্রকাশ করে। স্মিথ কখনো পণ্য উৎপাদনে শ্রমের পরিমাণ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করেছেন, কখনো করেছেন অন্য পণ্যের সহিত বিনিময়ের মাপকাঠিতে। অর্থাৎ, একই পণ্যের মূল্যমান স্মিথ একবার শ্রমমূল্য দিয়ে পরে বিনিময়মূল্য দিয়ে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এই দুটি বিভিন্ন মূল্যমানের স্বরূপ বিশ্লেষণ না করেই স্মিথ উদ্বৃত্ত মূল্যের ধারণায় এসেছেন। আসলে উদ্বৃত্ত মূল্য হোল পণ্যের বিনিময়মূল্য ও শ্রমমূল্যের বিয়োগফল। পণ্যের জন্য শ্রমের মূল্য ও শ্রমজাত পণ্যের মূল্য, যা আসলে পণ্যের বাজার দর, স্মিথের বিশ্লেষণে এ দুয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়নি। অর্থাৎ, শ্রমের মূল্য ও সেই শ্রমজাত পণ্যের বিনিময় মূল্য—দুয়ের পরিমাণ একই ধরে নিয়ে স্মিথ জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। স্মিথের বিশ্লেষণে জটিলতা ও বিভ্রান্তির কারণটি মার্কস যথাযথ ভাবে বিবৃত করেছেন।

কিন্তু এই বিভ্রান্তি ধরা পড়েছে স্মিথের উদ্বৃত্ত মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে। স্মিথ এই সূত্রে পরিষ্কার বলেছেন, শ্রমিক আপন শ্রম দিয়ে প্রতিটি পণ্যে যে মূল্য সঞ্চার করে থাকে তা দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি অংশ শ্রমিককে শ্রমের মূল্য হিসেবে দেওয়া হয়, অপর অংশ মালিক তার নিয়োজিত পুঁজির দরুন মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করে। মার্কস বলছেন, স্মিথ মুনাফার এই যে বিশ্লেষণ

করেছেন তাতে পরিষ্কার দেখাতে চেয়েছেন যে মুনাফা শ্রমিকের শ্রম থেকেই উদ্ভূত অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম যে সমগ্র মূল্যমানের সৃষ্টি করে তার এক অংশ মুনাফা হিসেবে স্বীকৃত হয় সুতরাং পণ্যের বিনিময়ের দরুন যে আয় হয় সেই আয়ের সমগ্রটাই শ্রমিকের সৃষ্টি তাই আসলে শ্রমের প্রকৃত মূল্যমান। শ্রমের প্রকৃত মূল্যমানের উপর বাড়তি আয় মুনাফা নয়। বিনিময়জাত মূল্য থেকে শ্রমিককে তার প্রাপ্য অংশ না দিয়ে যা আত্মসাৎ করা হয় পণ্য উৎপাদনের দরুন মুনাফা তার মধ্যে থাকে, অর্থাৎ শ্রমিক যে সমগ্র মূল্যমানের সৃষ্টি করে, মুনাফার অংশটি সেই মূল্যমানের মধ্যেই থাকে। সুতরাং শ্রমিকের শ্রম-সময় দুভাগে ভাগ করা যায়—একভাগ শ্রম-সময় থেকে যে মূল্যমানের উদ্ভব হয় তা শ্রমিকের শ্রম-মূল্য হিসেবে স্বীকৃত হয়, শ্রম-সময়ের অপর ভাগ শ্রমিকের ভোগে লাগে না। উদাহরণ স্বরূপ মার্কস স্মিথের একাধিক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, যেমন, এক জায়গায় স্মিথ লিখেছেন: "In this state of things the whole produce of labour does not always belong to the labourer. He must in most cases share it with the owner of the stock which employs him." অর্থাৎ স্মিথ এখানে পরিষ্কার দেখাতে চেয়েছেন যে, পণ্যের প্রকৃত মূল্য থেকে সেই পণ্যোৎপাদনে শ্রমিকের শ্রমের দরুন একটি নির্ধারিত মূল্য, যা আসলে শ্রমের প্রকৃত মূল্য নয়, বাদ দেওয়ার পর যে অংশ থাকে সেই উদ্বৃত্ত অংশ বা মূল্যের মধ্যেই মুনাফা নিহিত থাকে কিংবা বলা চলে পণ্যের জন্য নিযুক্ত শ্রমের মূল্য থেকে প্রাপ্ত মূল্যের বিয়োগ কালে উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং উদ্বৃত্ত মূল্য আসলে উদ্বৃত্ত শ্রম যা নাকি শ্রমের মালিক শ্রমিকের ভোগে লাগে না, পুঁজির মালিকের মুনাফা হিসেবে স্বীকৃত হয়—এবং জমির মালিকের খাজনা হিসেবেও। কেন না চাষী তার উৎপাদিত দ্রব্যের এক ভাগ খাজনা হিসেবে জমির মালিককে প্রদান করে। চাষীর শ্রমের অংশ জমির মালিকও গ্রহণ করে।

এই একই হিসেবে উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে সুদের অংশটিও থেকে যায়। পুঁজি সংগ্রহের দরুন পুঁজিপতিকে যে ঋণ করতে হয় সেই ঋণের সুদ শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই জোগানো হয়। সুতরাং মুনাফা, খাজনা ও সুদ, পণ্যোৎপাদনজাত এই তিনটি আর্থিক উপাদান উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে সংগৃহীত হয়। স্মিথের এই বিশ্লেষণটিই মার্কস মেনে নিয়েছেন। কিন্তু স্মিথ স্বকৃত উপরিউক্ত বিশ্লেষণের

স্রষ্টা হয়েও আরেক স্থানে বলেছেন : “They (profits of the stock) are however altogether different (from wages)···are regulated by quite different principles, and bear on proportion to the quantity, the hardship, or ingenuity of this supposed labour of inspection and direction. They are regulated altogether by the value of the stock employed and are greater or smaller in proportion to the extent of this stock.”—এই বক্তব্যে অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন যে, পুঁজির পরিমাণের (value of the stock) দ্বারাই নাকি মুনাফা নির্ধারিত হয়—কষ্টসাধ্য শ্রমের দ্বারা নয়। দেখা যাচ্ছে যে, স্মিথের যুক্তির বিভ্রান্তি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে জটিলতার সৃষ্টি করছে। এই বিভ্রান্তি থেকেই স্মিথ পণ্যের বাজার দরের এক সরলীকৃত ব্যাখ্যায় এসেছেন—তিনি এই বাজার দরকে শ্রমমূল্য, মুনাফা ও খাজনার যোগফল হিসেবে বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু স্মিথের বিশ্লেষণের ভ্রান্তিটুকু দেখিয়ে মার্ক্স বলেছেন যে, পণ্যমূল্যের মধ্যে স্থায়ী মূলধনেরও অংশভাগ রয়েছে, ফলে পণ্যমূল্য তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে :

পণ্যমূল্য = স্থায়ী মূলধন + শ্রম মূল্য + উদ্বৃত্ত মূল্য।

মূল্যের এই বিভাজন থেকে পণ্যোৎপাদনে শ্রেণীবিভাগও মার্ক্স করেছেন। অর্থাৎ সমাজের সমগ্র উৎপাদন দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে—ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও উৎপাদনী পণ্য বা যন্ত্রের উৎপাদন।

‘উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব’ পুস্তকের ২য় খণ্ডে মার্ক্স মূলত রিকার্ডোর অর্থনীতি-চিন্তার বিশ্লেষণ করেছেন। রিকার্ডোর তত্ত্ব আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, রিকার্ডোর বিশ্লেষণ যে-সব প্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি অভ্রান্ত নয়। ২য় খণ্ডে খাজনা তত্ত্বের (Theory of Rent) উদ্ভবের ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে এবং মার্ক্স আরো দেখিয়েছেন, রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্বের ভ্রান্তি তাঁর খাজনা তত্ত্বের প্রমাদপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপাদান।

রিকার্ডোর ব্যাখ্যায় মার্কস দেখিয়েছেন যে, পণ্যের উৎপাদনের জন্য শ্রমের পরিমাণ দিয়ে রিকার্ডো পণ্যের বিনিময় মূল্যের ব্যাখ্যায় এসেছেন। রিকার্ডোর মতে দুটি পণ্য সমমূল্যের হলে তাদের মধ্যকার শ্রমের পরিমাণও সমান হবে। তুলনীয়ভাবে মূল্য কম বেশি হলে বুঝতে হবে শ্রমের পরিমাণও পণ্যের মধ্যে

নির্দিষ্ট হারে কম বেশি রয়েছে। শ্রম-সময়ের মাপে পণ্যমূল্যের মাপ স্বীকার করে নিয়ে রিকার্ডো আর্থনীতিক সম্পর্কের সঙ্গে এই মূল্যতত্ত্বের যোগাযোগ কোথায় এবং কতখানি তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

স্মিথ যেখানে এসে থেমে দাঁড়িয়েছেন, শ্রম-সময়ের মাপে পণ্যের বাজার দর নির্ধারণের সমস্যায়, রিকার্ডো সেখান থেকে শুরু করেছেন। কিন্তু রিকার্ডোও বেশি দূর এগোতে পারেননি। স্মিথ-রিকার্ডোর জটিলতা প্রায় একই—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের মূল্য হিসেবে যা দেওয়া হয় সেই একই শ্রমজাত পণ্য বাজার থেকে আরো বেশি মূল্য আহরণ করে আনে বিনিময় মারফৎ। অর্থাৎ শ্রম দিয়ে যে পণ্যটি তৈরী হয় সেই শ্রমের দরুন প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পণ্যটিকে কেনা যায় না। প্রাথমিক যুগের বিনিময়প্রধান অর্থনীতিতে যা সম্ভব ছিল—পণ্য বিনিময় অর্থে শ্রমের বিনিময়—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের বিনিময় মূল্য বা প্রকৃত মূল্য কমে যাওয়ার ফলে শ্রমের দরুন প্রাপ্ত মূল্যে শ্রমজাত পণ্যটির বিনিময় ধনবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব হচ্ছে না, অথচ রিকার্ডোর বিশ্লেষণে পণ্য অর্থে শ্রম এ ধারণা টিকছে না। পণ্যমূল্য ও শ্রমমূল্য সমান হচ্ছে না বা পণ্য ও শ্রমের সমানুপাতিক আঙ্কিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না।

মার্কসের মতে, মূল্যতত্ত্বের সঙ্গে গড় মুনাফার হারের সংযোগ কোথায় রিকার্ডো তা বিশ্লেষণ করেননি। মার্কস বলেছেন, সামগ্রিক ভাবে একটি সাধারণ মুনাফার হার ধরে নেওয়ার আগে রিকার্ডোর উচিত ছিল, শ্রমমূল্য দ্বারা নির্ধারিত পণ্যমূল্যের সঙ্গে মুনাফা কেমন ভাবে জড়িত, এই তত্ত্বের বিশ্লেষণে আসা। এই বিশ্লেষণ থেকেই রিকার্ডো তাঁর বিরাট ভ্রান্তি অপনোদন করতে পারতেন ; তা হোল, উদ্বৃত্ত মূল্য আর মুনাফা সমার্থক নয়—রিকার্ডো কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফাকে একই বস্তু রূপে দেখেছেন।

এই প্রসঙ্গে মার্কস তাঁর গড় মুনাফার তত্ত্ব এবং উৎপাদনী মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Price of Production) আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং জমির খাজনা তত্ত্বকে (Theory of Rent) ঘিরে তা বিবৃত করেছেন। এইখানেও মার্কসের সঙ্গে রিকার্ডোর মতভেদ। রিকার্ডো জমির উৎপাদিকা শক্তির দরুন জমির প্রভেদমূলক খাজনার (Differential Rent) উৎপত্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী। অর্থাৎ একই পরিমাপের উর্বর জমি ও অনুর্বর জমির

উৎপাদনের পরিমাণের বিয়োগফল বা প্রভেদজনিত বাড়তি ফসল থেকেই খাজনার উৎপত্তি—এমন ধারণার জন্মদাতা রিকার্ডো।

মার্কস কিন্তু বিশুদ্ধ খাজনার (Absolute Rent) প্রসঙ্গ এনেছেন। মার্কসের মতে জমিতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার দর ও উৎপাদনী মূল্যের পার্থক্যজনিত পরিমাণ বিশুদ্ধ খাজনার উদ্ভাবক অর্থাৎ বাজার দর ও উৎপাদনী-মূল্যের বিয়োগে উদ্বৃত্ত অংশ থেকে জমির খাজনা সংগৃহীত হয়, অর্থাৎ চাষীর শ্রমের অংশ বা শ্রমজাত সম্পূর্ণ মূল্যের একটা অংশ জমির মালিক খাজনা হিসেবে আত্মসাৎ করে। সুতরাং দেখা যায় ভূমিজাত উৎপাদিত পণ্যের আহরিত মূল্যের মধ্যেই খাজনার অংশটি নিহিত থাকে। রিকার্ডোর খাজনার তত্ত্ব থেকে কিন্তু এই ধারণায় আসা যায় না কেন না রিকার্ডো পণ্যমূল্য ও পণ্যের উৎপাদনী মূল্য এক করে দেখেছেন। সুতরাং মার্কসের মতে রিকার্ডোর পণ্য-মূল্যের বিশ্লেষণের ভ্রান্তির মধ্যেই তাঁর পার্থক্যজনিত খাজনা তত্ত্বের অসারতা নিহিত।

জমির উর্বরতা ভেদে উৎপাদনের পার্থক্যই কেবলমাত্র জমির খাজনার জন্ম দেয়, রিকোর্ডোর এই ধারণা মার্কস স্বীকার করেন না। মার্কসের মতে উর্বরতা ভেদে খাজনার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি অত্যন্ত অনুর্বর জমিও খাজনার আওতায় পড়ে কারণ ভূমিজাত উৎপাদনের সমগ্র মূল্যের একটা অংশই খাজনা হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। চাষী তার প্রকৃত শ্রমের সমগ্র মূল্য নিজের ভোগে লাগাতে পারে না—ভূমির মালিককে তার শ্রমের ভাগ দিতে হয় অর্থাৎ শ্রমমূল্যের অংশই মার্কসীয় মতে বিশুদ্ধ খাজনা। জমির উর্বরতার হ্রাসবৃদ্ধির দরুন উৎপাদিত পণ্যের সামগ্রিক মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে—সেই কারণেই খাজনারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। এখানেই মার্কসীয় মতে পার্থক্যজনিত খাজনার (Differential Rent) উদ্ভব কিন্তু আসলে তা বিশুদ্ধ খাজনারই অন্তর্ভুক্ত।

'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' পুস্তকের তৃতীয় ভাগে মার্কস ইংরেজ সমাজতান্ত্রিক ধন-বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে মার্কস বিবৃত করেছেন বুর্জোয়া ধনবিজ্ঞানের বিকৃতির ইতিহাস। তৃতীয় ভাগে দেখিয়েছেন, পুঁজিপতি ও নির্বিত্তের শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিফলন ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে কেমন ভাবে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে।

পরিশিষ্ট—৩

কার্ল মার্কসের জীবন সংক্রান্ত ঘটনার কালানুক্রম

১৮১৮	মে ৫	কার্ল হাইনরিখ মার্কস-এর জন্ম।
১৮২৪		মার্কস পরিবারের প্রোটেস্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ।
১৮৩০		ট্রিয়ের হাইস্কুলে পাঠারম্ভ।
১৮৩৫	অক্টোবর	বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে প্রবেশ লাভ।
১৮৩৬	অক্টোবর	বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠারম্ভ। বার্লিনে ডক্টরস ক্লাবে যোগদান। কাব্য ও সাহিত্য চর্চার শুরু। নব্য হেগেলবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ।
১৮৩৮	জানুয়ারি	হ্যালে বার্ষিকী (Hallische Jahrbucher) পত্রিকার প্রকাশ—নব্য হেগেলবাদীদের মুখপত্র।
	মে	পিতা হাইনরিখ মার্কস-এর মৃত্যু।
১৮৩৯		মার্কসের গবেষণা-পত্র ('ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউ-রাসের দর্শনচিন্তার পার্থক্য') রচনার শুরু।
১৮৪১	এপ্রিল	গবেষণার সমাপ্তি ও জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব ফিলজফি' উপাধি লাভ।
১৮৪২	জানুয়ারি	'রাইনিশে ৎসাইটুঙ' নামক পত্রিকার প্রকাশ। 'আনেকডোটা' পত্রিকায় প্রাশিয়ান সেন্সর ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের প্রকাশ।
	মার্চ	মার্কস-প্রেয়সী জেনীর পিতা ব্যারন ফন ভেস্টফালেন-এর মৃত্যু।
	এপ্রিল	'রাইনিশে ৎসাইটুঙ'-এ মার্কসের লেখা শুরু।
	অক্টোবর	মার্কস 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ'-এর সম্পাদনার ভার পেলেন।
১৮৪৩	মার্চ	মার্কসের বিখ্যাত নিবন্ধ 'হেগেলীয় রাষ্ট্র-দর্শনের আলোচনা'র প্রকাশ।
		রাইনিশের সম্পাদক পদ থেকে বিদায়।

	এপ্রিল	প্রাশিয়ার সরকারী নির্দেশে রাইনিশে ৎসাইটুঙের প্রকাশ স্থগিত।
	জুন ১৯	জেনী ফন ভেস্টফালেনের সঙ্গে মার্কসের বিবাহ।
	অক্টোবর	মার্কসের প্যারিসে গমন। আর্নল্ড রুগের সহযোগিতায় 'ডয়েটশে ফ্রানৎসোসিশে ইয়ারবুখের' নামক পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা।
১৮৪৪	ফেব্রুয়ারি	মার্কস ও আর্নল্ড রুগের যুগ্ম সম্পাদনায় 'ডয়েটশে ফ্রানৎসোসিশে ইয়ারবুখের' (জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী) পত্রিকার প্রকাশ। এই পত্রিকায় এঙ্গেলসের প্রথম রচনা 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির কাঠামো' এবং মার্কসের দুটি বিখ্যাত রচনা 'হেগেলের অধিকার দর্শনের সমালোচনার ভূমিকা' ও 'ইহুদী সমস্যা' বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
	এপ্রিল	আর্নল্ড রুগের সহিত মার্কসের বিচ্ছেদ। 'Vorwarts' পত্রিকায় মার্কসের রচনা প্রকাশ।
	মে ১	মার্কসের প্রথমা কন্যা জেনী মার্কসের জন্ম।
	সেপ্টেম্বর	এঙ্গেলসের সহিত পরিচয়। দুজনে একত্রে 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ।
	নভেম্বর-ডিসেম্বর	মার্কসের প্রথম পুস্তক 'প্যারিস ম্যানাস্ক্রিপ্ট' নামে পরিচিত ও মার্কসের জীবিতকালে অপ্রকাশিত —যার ইংরেজী অনুবাদের শিরোনাম: 'Economic and Philosophical Manuscript' গ্রন্থের রচনা।
১৮৪৫	জানুয়ারি	প্রাশিয়ান সরকারের চাপে প্যারিস থেকে মার্কসের বিতাড়ন।
	ফেব্রুয়ারি	মার্কসের ব্রুসেলস আগমন। 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থের প্রকাশ।
	বসন্তকাল	মার্কসের 'থিসিস অন ফয়েরবাখ' পুস্তকের রচনা।
	মে	মার্কস-বন্ধু যোসেপ ভিডেমেয়ের ও অটোলুনিং-এর সম্পাদনায় 'Die Westphalisches Dampfboot'

		পত্রিকার প্রকাশ। ওই পত্রিকায় মার্কসের রচনাও প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে মোসেস হেসের পরিচালনায় 'Gesellschaftsspiegel' পত্রিকাও বের হয়। এই পত্রিকায় মার্কসের রচনা প্রকাশিত হয়।
	জুলাই	মার্কস ও এঙ্গেলস একত্রে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির পাঠ নিতে শুরু করেন। মার্কসের সঙ্গে চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পরিচয় ঘটে। 'লীগ অব দি জাস্ট' নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
	সেপ্টেম্বর ২৬	কন্যা লরা মার্কসের জন্ম।
	ডিসেম্বর	প্রুশীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ।
১৮৪৫-৪৬		মার্কস ও এঙ্গেলস যুগ্মভাবে রচনা করেন 'জার্মান চিন্তাধারা'।
১৮৪৬	জানুয়ারি	য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র রচনার জন্য লণ্ডন, প্যারিস ও বার্লিনে মার্কসের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 'করেসপণ্ডেন্স কমিটী' স্থাপিত হয়। ব্রুসেলসের শাখা সমিতি থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস বিভিন্ন শাখা সমিতিগুলিতে চিঠিপত্র ও নির্দেশাদি পাঠানো শুরু করেন।
	ডিসেম্বর	পুত্র এডগার মার্কসের জন্ম।
১৮৪৭	ফেব্রুয়ারি	লণ্ডনের 'লীগ অব দি জাস্ট'-এর সদস্য যোসেপ মোল মার্কস ও এঙ্গেলসের সহিত ব্রুসেলসে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের সমিতির সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
	জুন	এঙ্গেলস লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'লীগ অব দি জাস্ট'-এর অধিবেশনে যোগদান করেন। ওই অধিবেশন থেকেই লীগের নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নামকরণ হয় 'কমিউনিস্ট লীগ'। মার্কস রচিত 'দর্শনের দারিদ্র্য' পুস্তকের প্রকাশ।
	নভেম্বর-ডিসেম্বর	মার্কস ও এঙ্গেলস লণ্ডনে 'কমিউনিস্ট লীগে'র দ্বিতীয়

		অধিবেশনে যোগ দেন। লীগের একটি কার্যসূচী রচনার জন্য মার্কস ভারপ্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডের 'নর্দার্ন স্টার' পত্রিকায় মার্কসের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ব্রুসেলসে মার্কস জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘে 'মজুরী, শ্রম ও পুঁজি' শিরোনামে একটি লিখিত বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি পরে (১৮৯১) ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।
১৮৪৭-৪৮		'ডয়েটশে ব্রুসেলের ৎসাইটুঙ', 'ট্রিয়েরশে ৎসাইটুঙ' ও 'রিফর্ম' পত্রিকায় মার্কসের রচনাদির প্রকাশ।
১৮৪৮	ফেব্রুয়ারি	লণ্ডনে মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত জার্মান ভাষায় 'সাম্যবাদী ইস্তাহার'-এর প্রকাশ। প্যারিসে ঐতিহাসিক ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভের শুরু।
	মার্চ	বেলজিয়ম থেকে মার্কস বহিষ্কৃত। প্যারিস গমন। মার্কস 'কমিউনিস্ট লীগে'র সভাপতি পদে নির্বাচিত।
	এপ্রিল	জার্মানীর গণবিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য মার্কসের জার্মানী গমন।
	জুন	মার্কসের সম্পাদনায় কোলোন শহরে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ' নামক পত্রিকার প্রকাশ। এই পত্রিকায় (১৮৪৮-৪৯) মার্কসের একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়।
	আগস্ট	বার্লিন ও ভিয়েনায় মার্কস গণবিক্ষোভের সমর্থনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।
১৮৪৯	ফেব্রুয়ারি ৮	রাজবিদ্রোহে উত্তেজনা সঞ্চারকারী হিসেবে কোলোন শহরে মার্কসের বিচার ও মুক্তিলাভ।
	মে	মার্কসের প্যারিস থেকে বহিষ্কার। 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ'-এর প্রকাশ বন্ধ। বন্ধের আগে মার্কসের বক্তৃতা 'শ্রম, মজুরী ও পুঁজি' 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই রচনা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের সম্পাদনায় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে।

	আগস্ট	মার্কসের লণ্ডন আগমন ও লণ্ডনে স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্যোগ।
	নভেম্বর ৫	পুত্র গিডো মার্কসের জন্ম।
১৮৫০		মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক যুগ্মভাবে 'কমিউনিস্ট লীগের সেণ্ট্রাল কমিটীর প্রতি বক্তব্য' রচনা। মার্কসের 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮-৫০' পুস্তকের প্রকাশ।
	নভেম্বর ১৮	পুত্র গিডো মার্কসের মৃত্যু।
	ডিসেম্বর	লণ্ডনে সোহো অঞ্চলে ২৮, ডীন স্ট্রীটে বাসা বদল।
১৮৫১	মার্চ ২৮	কন্যা ফ্রান্সিসকা মার্কসের জন্ম।
	আগস্ট	'নিউইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন'-এ মার্কসের রচনা শুরু। ১৮৬২ সাল পর্যন্ত মার্কস এই পত্রিকায় ধারাবাহিক সংবাদভাষ্য রচনা করেছেন।
১৮৫২	মার্চ	মার্কসের 'লুই নেপোলিয়নের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' রচনা।
	এপ্রিল ১৪	কন্যা ফ্রান্সিসকার মৃত্যু।
	নভেম্বর	মার্কসের প্রস্তাব ক্রমে 'কমিউনিস্ট লীগের' অবসান ঘোষণা।
১৮৫৩		লণ্ডনে 'পিপলস্ স্টার' পত্রিকায় রচনা শুরু।
১৮৫৪		মার্কসের 'পামারস্টোন ও রাশিয়া' এবং 'পামারস্টোন ও তাঁর কীর্তি' পুস্তিকাদ্বয়ের প্রকাশ।
১৮৫৫	জানুয়ারি ১৬	কন্যা ইলিনর মার্কসের জন্ম।
	এপ্রিল ৬	পুত্র এডগার মার্কসের মৃত্যু।
		এই বছরে 'নয়ে ওডের ৎসাইটুঙ'-এ রচনা প্রকাশ।
১৮৫৬	জুলাই ২৩	মার্কসের শ্বশ্রুমাতা ব্যারোনেস ক্যারোলিন ফন ভেস্টফালেনের মৃত্যু।
	আগস্ট	মার্কস কর্তৃক 'অষ্টাদশ শতাব্দীর গোপন কূটনৈতিক ইতিহাস' ও 'লর্ড পামারস্টোনের জীবনকাহিনী' রচনা।
	অক্টোবর	লণ্ডনে গ্রাফটন টেরেসে বাসা বদল।

১৮৫৬-৫৮		লণ্ডনের 'ফ্রি প্রেস' ও 'ডিপ্লোম্যাটিক রিভিউ' পত্রিকায় রচনা প্রকাশ।
১৮৫৭		মার্কসের জার্মান ভাষায় 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রাথমিক আলোচনা' (Grundrisse der Kritique der Politischen Okonomie) পুস্তকের রচনা।
১৮৫৯	জুন	মার্কসের নতুন রচনা 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা' (Zur Ktitik der Politischen Okonomie) নামক পুস্তকের রচনা ও প্রকাশ। 'ডাস ফক' পত্রিকায় নিবন্ধের প্রকাশ।
১৮৬০	ডিসেম্বর	মার্কসের 'হের ফগ্‌ট্' রচনা।
১৮৬১-৬২		'ডি প্রেসে' পত্রিকায় মার্কিন গৃহযুদ্ধের উপর নিবন্ধ রচনা।
১৮৬৩	নভেম্বর ৩০	মার্কসের মাতৃদেবী হেনরিয়েটা মার্কসের মৃত্যু।
১৮৬৪	মার্চ	লণ্ডনের মেটল্যাণ্ড পার্ক রোডে নতুন বাড়িতে বাসা বদল।
	সেপ্টেম্বর ২৮	'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা ও জেনিভায় প্রথম কংগ্রেস। 'আন্তর্জাতিকের' জন্য মার্কসের 'উদ্বোধনী ভাষণ' এবং 'সংবিধান' রচনা।
১৮৬৪-৬৭		লণ্ডনের 'দি বিহাইভ' পত্রিকায় নিবন্ধাদির প্রকাশ।
১৮৬৫	মে	আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে মার্কসের লিখিত বক্তৃতা 'মূল্যমান, বাজারদর ও মুনাফা' পঠিত: ১৮৯৮ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত।
১৮৬৭	এপ্রিল	'ডাস ক্যাপিটাল' মুদ্রণের জন্য পাণ্ডুলিপি নিয়ে মার্কসের হামবুর্গ যাত্রা।
	সেপ্টেম্বর	লুসেনে আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। হামবুর্গে 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর প্রকাশ।
১৮৬৭-৭৩		আন্তর্জাতিকের সাত বছরে মার্কস আন্তর্জাতিকের জন্য নানান ইস্তাহার, কার্যসূচী ও ঘোষণা পত্র রচনা করেছেন।

১৮৬৮	এপ্রিল	মার্কসকন্যা লরার সহিত পল লাফার্গের বিবাহ।
	সেপ্টেম্বর	ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস।
১৮৬৯	সেপ্টেম্বর	Basle শহরে আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেস।
১৮৭১	মার্চ ১৮	প্যারী কমিউনের প্রতিষ্ঠা।
	জুন-জুলাই	মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকের প্রকাশ।
	সেপ্টেম্বর	লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের অধিবেশন।
১৮৭২	সেপ্টেম্বর	হেগ শহরে আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেস।
	অক্টোবর	মার্কসকন্যা জেনীর সহিত চার্লস লঙ্গুয়েটের বিবাহ।
১৮৭৪	আগস্ট	বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভের জন্য মার্কসের আবেদন নামঞ্জুর।
১৮৭৫	মে	জার্মান ভাষায় মার্কসের 'গোথা কার্যসূচীর আলোচনা' পুস্তকের প্রকাশ।
১৮৭৮		এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি ডুহ্‌রিং' পুস্তকের প্রকাশ, এই পুস্তকের ২য় খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদ মার্কসের রচনা।
১৮৮১	ডিসেম্বর ২	মার্কসপত্নী জেনী মার্কসের মৃত্যু
১৮৮২	ফেব্রুয়ারি-অক্টোবর	স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে মার্কসের আলজিয়ার্স, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডে ভ্রমণ।
১৮৮৩	জানুয়ারি ১১	মার্কসকন্যা জেনী লঙ্গুয়েটের মৃত্যু।
১৮৮৩	মার্চ ১৪	কার্ল মার্কসের মৃত্যু।
	মার্চ ১৭	লণ্ডনে হাইগেট সমাধি-ক্ষেত্রে মার্কসের মরদেহ সমাধিস্থ।
১৮৮৫		এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কসের ডাস ক্যাপিটালের ২য় খণ্ডের প্রকাশ।
১৮৯৪		এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কসের ডাস ক্যাপিটালের ৩য় খণ্ডের প্রকাশ।
১৮৯৫		ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের মৃত্যু।
১৯০৫-১০		কার্ল কাউটস্কি কর্তৃক মার্কসের 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' (Theorien uber der Mehrwert) পুস্তকের প্রকাশ।

কার্ল মার্কসের বংশধারা

